সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিকথা

সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিকথা



বিজয়ন প্রকাশনী
৩াব, সীতাকান্ত ব্যানার্জি লেন,
কলকাতা ৭০০০০৫

প্রথম প্রকাশ : ১০০০

প্রকাশক :
সাধনা মুখোপাধ্যায়
৩বি, সীতাকান্ত ব্যানার্জি লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৫

মুদ্রাকর :
ক্যালকাটা ব্লক অ্যান্ড প্রিন্ট
৫২/২, শিকদারবাগান স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৪

অক্ষরবিন্যাস :
প্রদ্যুৎ সাহা ও প্রণব সাহা
লেজার বাইট
৭, কামারডাঙ্গা রোড,
কলকাতা ৭০০ ০৪৬

প্রচ্ছদ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

উৎসর্গ

সাঁওতাল বিদ্রোহে নিহত অমর শহীদদের উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

১৯৫৬ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এই বিদ্রোহ নিয়ে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত হয়। কয়েকটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচিত হয়। অনেক আগেই এই বিষয় সম্বন্ধে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় কালীকিঙ্কর দত্ত লিখিত গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা হয়। সরকারি দলিলপত্রেও এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া হান্টার, ও ম্যালি, ব্রাডলি বার্ট, বাকল্যান্ড প্রমুখ লেখকরাও এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক আন্দোলন সংঘটিত করতে গিয়ে এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে মূল্যায়ন করে। এই সব বিদ্রোহকে কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্ববিদরা সামন্ততন্ত্র বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম হিসেবে উল্লেখ করেন। ১৯৩৬ সাল থেকে কৃষক সভা আদিবাসী ও কৃষক সংগ্রাম সম্বন্ধে নতুন করে মূল্যায়ন করে। এই বিদ্রোহগুলোর গুরুত্ব জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে।

পরে একই ধারায় সুপ্রকাশ রায় কৃষক ও আদিবাসী বিদ্রোহগুলো নিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা করেন। বহু তথ্যের সাহায্যে তিনি এই বিদ্রোহগুলোর গণভিত্তি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেন। অরুণ চৌধুরী, তারাপদ রায় ও গৌরহরি মিত্র তাঁদের আলোচনার মাধ্যমে এই ধারাটিকেই সমৃদ্ধ করেন। সাম্প্রতিককালে সাব-অলট্রান গ্রুপের বিখ্যাত তত্ত্ববিদ রণজিৎ গুহ আদিবাসী বিদ্রোহগুলোর বিশ্লেষণ করে আরও আলোকপাত করেন। বিনয়ভূষণ চৌধুরী আদিবাসী জীবনধার বিভিন্ন দিক্ নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক পর্যালোচনা করেন। এই সব আলোচনা আদিবাসী বিদ্রোহ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে স্বচ্ছ করতে সহায়ক হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আদিবাসী সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করায় আমরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাই। ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে, পশুপতি প্রসাদ মাহাতো ও আরও কয়েকজন আদিবাসী লেখক এই বিদ্রোহ ও অন্যান্য আদিবাসী বিদ্রোহ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

শ্রীবুদ্ধেশ্বর টুডু 'সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিকথা' গ্রন্থে বহু প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। যাঁরা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সাঁওতালদের

সংগ্রামকে 'অসম যুদ্ধ বলে অভিহিত করে থাকেন' তাঁদের সঙ্গে লেখক একমত নন। তিনি লেখেন, সাঁওতালদের নেতা সিধু কানহু জমিদার, জোতদার, মহাজন, আমলা ও পুলিশ বাহিনীর সীমাহীন শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রাম করতে গিয়ে পুলিশী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তাকে "যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া যায় না"। লেখক এই কথাও বলেন, সাঁওতাল বিদ্রোহীদের 'ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা' করার উদ্দেশ্য ছিল না। বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে লেখক, এই বিদ্রোহের গণভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ চর্চায় এই গ্রন্থটি এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে সমাদৃত হবে বলে আমার ধারণা।

মুখবন্ধ

সম্রাট আকবরের রাজসভার অন্যতম সভাসদ ছিলেন বীরবল। এই বীরবলকে নিয়ে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে; তাদের অনেকগুলিই আমাদের জানা। সম্রাট আকবর বীরবলকে অন্য চোখে দেখতেন, তার গুণের কদর করতেন। এই কারণে অন্য সদস্যারা সম্রাটের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং বীরবলকেও ঈর্ষা করতেন। একদিন সে কথা সম্রাটকে তাঁরা খুলেই বললেন যে, বীরবলের কী এমন গুণ আছে যে, সে সম্রাটের প্রিয়পাত্র; মাইনেও বেশি পায়? সম্রাটের প্রথাগত শিক্ষা ছিল না বটে, কিন্তু তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন। তাই তাঁদের এ কথার সোজাসুজি কোন উত্তর দিলেন না। তিনি উপমার আশ্রয় নিলেন। ঘটনাচক্রে ইতিমধ্যে রাজপ্রসাদে এক ছাগল ছানা প্রসব করেছিল। সম্রাটের কানেও সেই কথা পৌছে গিয়েছিল। রাজসভায় সভাসদরা আসতেই সম্রাট ছাগল-ছানা প্রসবের সংবাদ দিলেন এবং একে একে সবাইকে সংবাদের সত্য-মিথ্যা যাচাই এর জন্য ঘটনাস্থলে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরাও একে একে সবাই ঘটনাস্থলে গিয়ে দূর থেকে দেখে রাজসভায় ফিরে এলেন কিন্তু বীরবল ছাড়া আর কেউ লেজ উল্টে দেখলেন না মাদি না মর্দার বাচ্চা। তাই সম্রাটের কাছে এসে একমাত্র বীরবল ছাড়া আর কেউ সদুত্তর দিতে পারেননি। ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীদের অবস্থাও ওই লেজ উল্টে না দেখা সভাসদদের মত। সাঁওতালদের লেখা দেখলেই পাশ কাটিয়ে চলে যান, লেজ উল্টে দেখেন না। দু' একজন ব্যতিক্রমী যাঁরা আছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নয়, একদেশদর্শী। সেই কারণেই ১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামকে তাঁরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলতে নারাজ; কারণ, তাঁরা বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে সংঘটিত লুঠতরাজ এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনার উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজব্যবস্থায় কোনো সংবাদপত্রই নিরপেক্ষ হতে পারে না। এ কথা আমরা সবাই জানি। তাহলে সেই সময়কার নির্ভীক নিরপেক্ষ দৈনিক সংবাদপত্রে পরিবেশিত সংবাদের সবটাই যে সত্য তার মধ্যে যে শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না এ কথা কি জোর দিয়ে বলা যায়? প্রভুর উচ্ছিষ্ট লাভের আশায় প্রভুকে খুশি করার মতলব যে তাদের মধ্যে ছিল না এ কথাই বা কে বলতে পারে? "মুর্খের প্রভু হওয়া অপেক্ষা পণ্ডিতের গোলামী করা ভাল।"

আরও একটি আশ্চর্যের কথা : প্রচার হয়েছিল, সাঁওতালরা নাকি গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে হত্যা লীলা চালিয়েছিল। কিন্তু কত হাজার সাঁওতাল শহীদ হয়েছিল তা মোটামুটি জানা গেলেও—কত সাধারণ নিরীহ মানুষ সাঁওতালদের হাতে খুন হয়েছিল বা কতগুলি গ্রাম তারা জ্বালিয়েছিল তার সঠিক পরিসংখ্যান অনুপস্থিত। কিছু অত্যাচারী জমিদার, জোতদার, মহাজন ও পুলিশ খুন হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কতজন নিরীহ মানুষ নিহত হয়েছিল? এ বিষয়ে ইতিহাস নীরব। তাহলে কি ধরে নেবো যে ওসব কথা বিরোধীদের প্রচার মাত্র? E. G. Man, যিনি Assistant Commissioner হিসেবে সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে কাজ করতে এসে সাঁওতালদের সংস্পর্শে এসেছিলেন; Sonthalia and Santhal গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—সাঁওতাল বিদ্রোহে সব থেকে লাভবান হয়েছিলেন পাহাড়িয়ারা, যারা পাহাড়ের চূড়ায় থাকতেন, সাঁওতালদের পেছন পেছন আসতেন, সাঁওতালদের আগমনের সংবাদ পেয়ে জনসাধারণ বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলে তারা লুটপাট করতেন এবং ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতেন। দু-একটা ক্ষেত্রে আবার এমনও দেখা গেছে যাঁরা সাঁওতালদের অনুচর হিসেবে কাজ করতেন, তাঁরা মালসমেত ধরাও পড়েছেন। তাহলে তাদের কথাকে বেদবাক্য হিসেবে না মেনে কেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যারা পরিশ্রমী, যারা মূলতঃ কৃষিজীবী, যারা বতর (সুযোগ) গেলে বছর যায় মতবাদে বিশ্বাসী, তারা কৃষিকাজের উপযুক্ত সময়ে কৃষিকাজ ছেড়ে কেন বিদ্রোহী হলেন সেটা বিচার করব না?

সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতিমধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে অনেক বই রচিত হয়েছে। ‘সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিকথা’ অল্প সময়ের ব্যবধানে রচিত হলেও, ইতিমধ্যে রচিত বইগুলির সঙ্গে যে তার দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক আছে, সেটা বইটি মন দিয়ে পড়লে যে-কেউ বুঝতে পারবেন। আলোচ্য ‘সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিকথা’-য় সাধারণ পাঠকদের কথা ভেবেই ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে তার বঙ্গানুবাদও দেওয়া আছে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অমলেন্দু দে-কে বইটার জন্য একটা ভূমিকা লিখে দেবার অনুরোধ করেছিলাম। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি যে আমার অনুরোধে সাড়া দিয়েছেন, তার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

মাননীয় অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের একান্ত চেষ্টায় বইটা পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত।

প্রথম খণ্ড

ভগনাডিহির সমাবেশ থেকে হুলের সিদ্ধান্ত গৃহীত

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৮৫৫ খৃস্টাব্দের ৩০ জুনের কথা রক্তের অক্ষরে লেখা থাকবে। কারণ এই ৩০ তারিখেই বারহেটের অদূরে ভগনাডিহির মাঠে অনুষ্ঠিত এক সুবিশাল সমাবেশে দামিনের অত্যাচারী জমিদার, মহাজন এবং তাদের মদতদাতা, প্রধান পৃষ্ঠপোষক বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে হুলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। বলা হয় চুনার মুরমুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সিধুর নির্দেশেই এই গণ জমায়েত। সচেতন অথবা অচেতন যেভাবেই হোক তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন এ কথা সত্য। আজ থেকে কয়েক'শ বছর আগে অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন সংঘটিত করার প্রয়াসকে অবশ্যই অভিনব এবং বৈপ্লবিক বলতে হবে। জমায়েতের পূর্বে সাঁওতালি রীতি রেওয়াজ অনুযায়ী পাতা সমেত শাল গাছের ডাল সংক্ষেপে "শালগিরা" এ গ্রাম সে গ্রাম হয়ে সমগ্র দামিন-ই-কোয় ছড়িয়ে পড়েছিল। জমায়েতের খবরে সবাই কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। নির্ধারিত দিনে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল নরনারী মাদল ধামসা কাঁধে নিয়ে তীরধনুক বগলদাবা করে জমায়েতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই আন্দোলনের মূল হোতা সিধু এবং কানহু। এদের ব্যক্তিগত চরিত্র অমলিন। তাঁরা তাঁদের শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার ও শোষণ সম্পর্কে আন্তরিকভাবেই ছিলেন বিদ্রোহী। The friend of India-র কথায়—

"As to seedoo and Kanoo there is evidence to show that their personal characters were at least bold, original and persevering. They were too, it seems personally and deeply concerned in the common misfortunes of their race."[১]

তাঁদের অপর দুই ভাই চাঁদ এবং ভৈরো ছিলেন তাঁদের সহচর। সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে সিধু-কানহু বলতে থাকেন যে, তাঁরা পরপর কয়েকদিন ভগবানের দেখা পেয়েছেন। প্রথম দিন দেশী পোশাকে সাহেবের চেহারায়, দ্বিতীয় দিন অগ্নিশিখার মধ্যে জ্বলন্ত ছুরিকা হয়ে এবং তার পরদিন শালগুঁড়ির আকারে, যা দিয়ে সাঁওতালরা গরুর গাড়ির চাকা বানায়। এছাড়া তাঁরা বললেন, তিনি

১. W. W. Hunter. The annals of Rural Bengal—377

একখানি পবিত্র গ্রন্থ পাঠিয়েছেন এবং তাঁর নির্দেশ-লিখিত কাগজ টুকরো টুকরো হয়ে দামিনের সর্বত্র বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়েছে, যা থেকে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। সিধু-কানহুর উপরোক্ত বক্তৃতায়, সিধু কানহু অত্যাচারিত সাঁওতালদের ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে ধর্মীয় আবেগ যুক্ত করতে চেয়েছেন এ কথা সত্য, তবে যদি একটু তলিয়ে দেখি তবে দেখতে পাব কথাটার অবশ্যই একটা অর্থ হয়। তাঁরা বলেছেন, ভগবানকে তাঁরা প্রথমদিন দেখেছেন দেশী পোশাকে সাহেবের চেহারায় অর্থাৎ তাঁরা বোঝাতে চেয়েছেন জোতদার, জমিদার এবং তাঁদের মদতদাতা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার সম্মিলিতভাবে নিরীহ সাঁওতালদের উপরে যেভাবে দমন-পীড়ন শুরু করেছেন, এখানে সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় দিন অগ্নিশিখার মধ্যে জ্বলন্ত ছুরিকা হয়ে। অগ্নিশিখার মধ্যে ছুরি ধরলে জ্বলন্তই মনে হয়, তার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, ছুরিকে কখন জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে পোরা হয়? যখন ছুরি ভোঁতা হয়, যখন শান দেবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন। তার পরদিন তাঁরা দেখেছেন শালগুঁড়ির আকারে, যা দিয়ে সাঁওতালরা গরুর গাড়ির চাকা তৈরি করে। শালগুঁড়ি থেকেই গরুর গাড়ির চাকা তৈরি হয়। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। শালগুঁড়ি থেকে গরুর গাড়ির চাকা তৈরি গুণগত পরিবর্তনকে সূচিত করে। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় সম্মিলিত অত্যাচারের ফলে সাঁওতালদের অবস্থা যে সঙ্গীন হয়ে উঠেছে, সেই কথাই একটি উপমার সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছেন। এম. জি. ইয়র্ক অবশ্য অন্য কথা বলেন। তার মতে, Jay saw the Santals as giving legitimacy and credibility to Sidu and Kanu's Vision of a white man dressed in native attire because it symbolised so well the power of the "Saheb" and their aspiration to store it. This may well be true, but the emphasis is better placed on the power that this had to symbolise their attempts to overcome the structural distortion created by the failure of Mr. Pontet as a mediator. The image is almost one of the ghost of Palteen (Mr. Pontet), the white man who sympathetically understood their ways. At informal courts, they were not unlike their own "more hor" he had been able to sort out their conflicts and "stand between a Hor and Diku". Previously the Hakim had legitimised their way of life in the Damin. He was now being used to legitimised an organised attempt at revitalization.

"The symbol of the flame" according to york, with a knife

glowing in the midst appears to emphasize the belief that an armed struggle was necessary to attain their desires. The Cartwheel, which was a very important symbol of the uprising elude interpretation, due to the scarcity of material on these symbols.[২]

অর্থাৎ এডওয়ার্ড জয় প্রত্যক্ষ করলেন, সিধু-কানহুর দেশী পোশাকে সাহেবের চেহারায় ভগবানের দর্শন লাভকে সাঁওতালরা বৈধ এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করেছেন কারণ এই দর্শন লাভ সাহেবদের ক্ষমতা লাভ এবং তাকে কুক্ষিগত করার উদগ্র বাসনার ইঙ্গিতবাহী। ক্ষমতালাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করাটাকে যথার্থই বলতে হবে কারণ মধ্যস্থতাকারী মিঃ পন্টেটের ব্যর্থতার ফলে কাঠামোরচনার ক্ষেত্রে যে গলদ দেখা দিয়েছে তাকে ডিঙ্গিয়ে যাবার জন্য ক্ষমতাই একমাত্র সম্বল। প্রত্যক্ষ-গোচর মূর্তি পালটিন (মিঃ পন্টেট) সাহেবেরই অবিকল প্রতিমূর্তি, তিনি একমাত্র সাদা চামড়ার মানুষ যিনি তাদের সমস্যাকে সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি করবার চেষ্টায় রত। প্রথা বহির্ভূত বিচারালয় যেটা তাদের "মড়ে হড়ের" অবিকল নকল নয়, তিনি তাদের বিরোধের মীমাংসা করেন এবং "হড়" এবং দিকুর মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। পূর্বে হাকিম তাদের দামিনের জীবনের বৈধতা দিয়েছিলেন। এখন তিনি তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে বৈধতা প্রদানের চেষ্টা করছেন।

জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মধ্যে জ্বলন্ত ছরিকার প্রতীকটি ইয়র্কের মতে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের অপরিহার্যতা। গরুর গাড়ীর চাকা যেটা বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক, প্রতীকটিকে ব্যাখ্যা করবার মালমশলার অভাবে ব্যাখ্যা এড়িয়ে যান।

অতএব স্বীকার করতেই হবে তাঁরা জেনে বুঝেই জমায়েতে ভগবানের কথা উল্লেখ করেছেন।

সমবেত জনতা শান্ত এবং সুশৃঙ্খল। কারোর মুখে কোনো রা নেই। সভায় উপস্থিত সবাই প্রায় চুপচাপ। সভায় পিন পড়ার শব্দ শোনা যায়। তাঁরা বলতে থাকেন ঠাকুর তাঁদের বলেছেন, সাঁওতালদের জমি সাঁওতালদের হবে, তাঁদের দুঃখ দুর্দশার অবসান হবে এবং তাঁদের উপরে এতদিন ধরে যে অত্যাচার উৎপীড়ন চলে আসছে তাও দূর হবে।

সমাবেশে এও ঠিক হয় যে, তাঁরা আর হিন্দু মহাজনদের লাভের বখরা নিয়ে যেতে দেবে না। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের কথা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও ঠিক হল। কীর্তা মাঝি, ভাদো মাঝি এবং সুনো মাঝির

২. ড. এস. পি. সিনহা, সান্থাল হুল—৬৯

উপর ভার দেওয়া হল দরখাস্তের বয়ান তৈরি করে সবার কাছে তা পাঠিয়ে দেওয়া এবং পনের দিনের সময় দেওয়া হবে জবাব দেওয়ার জন্য। এরপর দরখাস্ত যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হল স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দপ্তরে দপ্তরে, কিন্তু সাঁওতালদের আবেদনে কেউ সাড়া দিলেন না। তাঁরা তাঁদের কাজ যথারীতি করে যেতে লাগলেন, সাঁওতালদের আবেদন এক পাশে কাগজ ফেলার ফালুতু ঝুড়িতে পড়ে রইল। বিভাগীয় কমিশনের অবস্থাও তথৈবচ। তিনি মস্ত বড় কর্মচারী। তিনি দেখলেন কাজকর্ম সবই হচ্ছে, রাজস্ব আদায় হচ্ছে, সবই ঠিকঠাক, এর মধ্যে সাঁওতালরা যখন বললেন তিনি যদি কিছু না করেন তবে তারাই প্রতিকারের চেষ্টা করবে তখন তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁদের আর্ত চিৎকারে কেউ যখন সাড়া দিল না তখন তাঁরা একরকম নিরূপায় হয়েই হুলের পক্ষে সিদ্ধান্ত নিলেন।

(১) নুসাসাবোন নওয়ারাবোন চেলেহঁ বাকো তেঁগোন
খাঁটি গেবন হুল গেয়াহো
খাঁটি গেবন হুল গেয়াহো
দিশম, দিশম দেশ মাঞ্জহি
নাতো নাতো মাপাঞ্জি কো
দুঃকবোন দানাংবোন বাংগেকো তেঁগোন
তবে দেবন হুল গেয়াহো।[৩]

অর্থাৎ আমাদের লড়াই আমাদেরই লড়তে হবে। সহযোদ্ধা হিসাবে কেউ যদি এগিয়ে না আসেও আমরা অবশ্যই বিদ্রোহ করব। অতি অবশ্যই বিদ্রোহ করব। পাশে কেউ না দাঁড়ালেও দেশ মাঞ্জহি, গ্রামের মাঝিরা আছেন। তারা আমাদের সাহায্য করবেন। রক্ষা করবেন। তাহলে কেন আমরা বিদ্রোহ করব না?

(২) চেদাঃক দরে সিধু
মায়াম তেদম উমেন?
চেদাঃক দরে কানহু হো
হুল হুলেম মেন?
জাইত ভাইকো লাগিৎ
মায়াম তেদএও উমেন
বেপারীয়া কোম্বড়ো হায়রে
দিশম দক হুহী।[৪]

৩. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস—৫৮।

৪. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস—১০৪।

অর্থাৎ কেনরে সিধু
রক্তের হোলি খেলা খেললি?
কেনরে কানহু
বিদ্রোহ বিদ্রোহ বলিস?
জাত ভাই এর জন্য রে ভাই
রক্তের হোলি খেলা খেললাম
মতলববাজ ব্যবসায়ী ব্যবসার নামে
জন্মভূমির সবকিছু চুরি করে নিয়ে গেল।

এই ভাবে দামিন-ই কোহ-য় শুরু হল হুল অর্থাৎ বিদ্রোহ। কিন্তু হুল কেন? কেন এই হুল?

সে কথা জানতে হলে আমাদের একটু পিছিয়ে যেতে হবে।

দামিন-ই-কোহ'র গোড়াপত্তন

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কালকে আমরা বিপ্লবের যুগ বলে অভিহিত করতে পারি। কারণ, এই দুই শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য তথা যুগান্তকারী ঘটনা সংঘটিত হয়। উদাহররণ স্বরূপ ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯), শিল্পবিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উত্থান, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লব, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, হবস, লক, রুশো, মন্তেস্কু প্রভৃতি মনীষীর আত্মপ্রকাশ, উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মনীষী কার্ল মার্কসের আবির্ভাবের কথা বলা যায়। এই বৈপ্লবিক তথা ঝঞঝা বিক্ষুব্ধ যুগের সূচনা হয় শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম এই বিপ্লব শুরু হয়। পরে ইউরোপের অন্য অংশে তা ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পবিপ্লবের ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে অধিক পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদিত হতে থাকে, ফলে এই সব পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। শিল্প বিপ্লবের এই চাহিদাকে পূরণ করে দিয়েছিল পঞ্চদশ শতকের ভৌগোলিক আবিষ্কার। পঞ্চদশ শতকের দুঃসাহসিক অভিযানের ফলে পৃথিবীর প্রায় পুরোটাই আবিষ্কৃত হয়েছিল। ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের বণিক শ্রেণী জাহাজে পণ্য বোঝাই করে পাল তুলে দিয়েছিল। পণ্য বোঝাই সেই জাহাজ জলে ভাসিয়ে নতুন আবিষ্কৃত দেশে সেই সব পণ্য আমদানি করিয়েছিল এবং সেখান থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে ইংল্যান্ড তথা ইউরোপের

বাজারে তা রপ্তানি করেছিল। ভারতবর্ষের East India Compay-ও অনুরূপ একটি বাণিজ্যিক সংস্থা। ইংরেজী ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন শাসনকর্তা রাণী প্রথম এলিজাবেথ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে প্রাচ্যে বাণিজ্য করবার অনুমতি প্রদান করেন, কিছু অর্থও সরবরাহ করেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে বাণিজ্য করতে এসে প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হলেও কালক্রমে সেই অসুবিধা কাটিয়ে উঠেছিল এবং একচেটিয়া বাণিজ্য স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে যখন রাজনৈতিক ডামাডোলের সৃষ্টি হয় তখন সেই ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে শাসন ক্ষমতাও হস্তগত করে। বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে পোহালে শর্বরী। ছিল বণিক হয়ে গেল শাসক, শাসনকর্তা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেশের শাসনকর্তা হয়েও বণিক সুলভ মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করতে পারল না। তাই দেশে অস্থিরতার সৃষ্টি হল। ভারতবর্ষের এখানে ওখানে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিল। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহগুলির মধ্যে পাহাড়িয়াদের বিদ্রোহ ছিল অন্যতম। পাহাড়িয়ারা পাহাড়ের উপরে বাস করতেন। কৃষিকাজ সম্বন্ধে তাঁরা অবহিত ছিলেন না। তাই শীতকালে ফসল পাকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা উপর থেকে নীচে সমতল ভূমিতে নেমে লুটপাট চালাতেন। ইংরেজ কর্মচারীরা পাহাড়িয়াদের বিদ্রোহ দমন করতে নেমে বুঝতে পারলেন যে, পাহাড়িয়ারা ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের জন্যই লুটপাট চালায়। তাই তাঁরা পাহাড়িয়াদের কৃষি কাজে উৎসাহ দেবার জন্য কৃষি জমির ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হলেন। ভাগলপুরের তৎকালীন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাদারল্যান্ড পাহাড়িয়াদের জন্য এক পরিকল্পনা রচনা করেন। তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে (১) পাহাড়ের তলস্থ সমতল এলাকা সম্পূর্ণভাবে সরকারি খাসমহল হিসাবে চিহ্নিত হবে (২) ওই পাহাড়িয়া এলাকা, যা পাহাড়িয়া অধিবাসীদের বাসস্থান, তা সম্পূর্ণ ভাবেই সরকারের হাতে থাকবে (৩) পাহাড় ও পাহাড়তলির সমতলভূমি এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে (৪) ওই এলাকার বিচার ও পুলিশ ব্যবস্থার অধীন বিষয় সমূহ ভাগলপুর জেলার অধীনস্থ হবে এবং বিশেষ ব্যবস্থার পরিবর্তে সকলের জন্য যে বিচার ও পুলিশি ব্যবস্থা তার অনুরূপ হবে।

সাদারল্যান্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ জুলাই ইংরেজ সরকার কর্তৃক দামিন-ই-কোহ বা পাহাড়ের প্রান্তদেশের পত্তন হল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর সহযোগী সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন টার্নার কর্তৃক সীমা নির্ধারিত হল। তার ভৌগোলিক পরিসীমা হল ১৩৬৬.০১ বর্গ মাইল। বর্তমানের সাহেবগঞ্জ, পাকুড় এবং রাজমহল তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জেমস পোন্টেন্ট দামিনের দায়িত্ব পেলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরকার দামিন-ই-কোহর প্রতিষ্ঠা

করে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিলেন। প্রথমতঃ, পাহাড়িয়াদের লুটপাট বন্ধ করা। দ্বিতীয়তঃ, বনভূমিকে পরিষ্কার করে চাষের আওতায় নিয়ে আসা এবং সরকারের জন্য রাজস্বের সংস্থান করা। কিন্তু পাহাড়িয়ারা সেখানে যেতে অসম্মত হলে (সাদারল্যান্ডের) সরকারের পরিকল্পনা মাঠে মারা যেতে বসেছিল। ইতিমধ্যে সাঁওতালরা সেখানে যেতে উৎসাহ দেখালে সরকার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। জায়গাটা তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল এবং সেখানে থাকার জন্য সরকার সাঁওতালদের উৎসাহ যোগাতে থাকলেন। ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে, বরাহভূম, শিখরভূম, ওড়িশা, বর্ধমান, বীরভূম, সিংভূম, কটক, ধলভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া থেকে দলে দলে সাঁওতালরা দামিন-ই-কোহয় আসতে লাগলেন। তাদের আগমনে দামিন-ই-কোহ জেগে উঠল। নির্জন অরণ্য প্রান্তরে ধ্বনিত হল মানুষের কলতান।

দামিন-ই-কোহ'র গোড়াপত্তনের নেপথ্য কাহিনী

রাজমহলকে বাংলাদেশের চাবিকাঠি বা Key of Bengal বলা হয়। কারণ উত্তর ভারত থেকে বাংলাদেশে ঢুকবার একমাত্র প্রবেশ পথ ছিল রাজমহলের পাহাড় দিয়ে ঢাকা। এই কারণেই রাজমহলের অতীত ইতিহাস, রাজমহল পাহাড়ের চড়াই উতরাই এর মত বৈচিত্রপূর্ণই শুধু নয় বাংলাদেশের বহু উত্থান পতনের নীরব সাক্ষী রাজমহল। সমসাময়িক বিভিন্ন লেখকের লেখায় রাজমহলের উল্লেখ থাকলেও রাজমহল সম্বন্ধে বিশদে বা বিস্তারিত ভাবে জানা যায় মোঘলদের ভারতবর্ষে আগমনের পরবর্তীকালে। সুপ্রাচীনকালে রাজমহল আগমহল নামে পরিচিত ছিল, আকবরের বিশ্বস্ত সেনাপতি মানসিং বঙ্গ বিজয়ে এসে বাংলাদেশের রাজধানী গৌড় থেকে আগমহলে স্থানান্তরিত করেন এবং আগমহলের নামও পরিবর্তন করে রাজমহল করেন। পরবর্তীকালে রাজমহলের জনপদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তার নাম পুনরায় পরিবর্তিত হয়, সম্রাট আকবরের নামে নামাঙ্কিত হয়ে আকবরনগরে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে গঙ্গার পথ পরিবর্তিত হয় এবং আরাকানের মগ এবং পর্তুগীজ জলদস্যুদের উৎপাত বৃদ্ধি পায়। এই সকল কারণে নবাব ইসলাম খাঁ রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। ঐতিহাসিক বার্ণিয়ের এবং তেবার্নিয়ের বর্ণনা থেকে জানা যায়, 'গঙ্গার দক্ষিণপাড়ে অবস্থিত রাজমহল এক মনোরম শহর। শহরে ঢুকবার রাস্তা ইট দিয়ে বাঁধানো। পূর্বে বাংলার শাসনকর্তা এখানে থাকতেন। ব্যবসা ছাড়াও শিকারের পক্ষে জায়গাটা

উপযুক্ত। কিন্তু নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে প্রায় সিকি (৩½) মাইল দূরে সরে যাওয়ায়, সঙ্গে সঙ্গে আরাকান এবং পর্তুগীজ জলদস্যুরা গঙ্গার মুখ ছেড়ে ঢাকা অভিমুখে রওনা হওয়ায়, শাসনকর্তা নিজে এবং বেনিয়ারা রাজমহল ছেড়ে ঢাকায় চলে যান। ঢাকা এখন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।'

শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ্ সুজা যখন বাংলার শাসনকর্তা হয়ে আসেন তখন পুনরায় বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়। তিনি বহু টাকা খরচ করে রাজমহলকে মনোরম করে তুললেন। তাঁর নিজের জন্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করেন এবং মান সিংহের তৈরি দুর্গকে শক্তিশালী করে অভেদ্য করে তুললেন। কিন্তু ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পিতার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে সিংহাসন দখলের উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনী নিয়ে রাজমহল ছেড়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে প্রথমে বাহাদুরপুর এবং পরে খানোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্তন করেন। ঔরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ এবং মীরজুমলার নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী শাহ সুজার পশ্চাদধাবন করে মুঙ্গেরে এসে পৌছায়। শাহ্ সুজা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে মুঙ্গের থেকে পুনরায় রাজমহলে চলে আসেন। ঔরঙ্গজেবের অনুগত সেনাবাহিনীও শাহসুজার পেছন পেছন রাজমহলে এসে উপস্থিত হলে শাহ্ সুজা তার পরিবারকে নিয়ে তাণ্ডায় পালিয়ে যান এবং তার সেনাবাহিনী সেখান থেকে নদী অতিক্রম করে মহম্মদ এবং মীরজুমলার বাহিনীর উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে তাঁদের বাহিনীকে আতঙ্কিত করে তোলেন। ইতিমধ্যে মহম্মদ, শাহ্ সুজার কন্যা, তাঁর ভবিষ্যত বাগদত্তার কাছ থেকে হাতে লেখা একটা চিঠি পান, তাই তিনি মীর জুমলার শিবির ছেড়ে তাণ্ডায় গিয়ে শাহ্ সুজার দলে যোগ দেন এবং তাঁর অধীন সেনাবাহিনীর একটা অংশকেও তাঁর দলে আনতে সমর্থ হন। এর ফলে মীর জুমলার সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও মীরজুমলা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ সুজাকে চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করতে সমর্থ হন। শাহ্ সুজার পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়, মোঘলদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলার তৎকালীন শাসনকর্তা মীর জুমলার সঙ্গে ইংরেজদের সংঘাত দেখা দেয়। মীরজুমলা রাজমহলে তাদের পণ্য বোঝাই নৌকা আটকে দিলে ইংরেজরাও তার প্রতিবাদ স্বরূপ হুগলীতে মীরজুমলার পণ্য বোঝাই নৌকা আটকে দেয়। মীরজুমলা ইংরেজদের এরূপ উদ্ধত আচরণে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবার হুমকি দিলে ইংরেজরা তাদের কৃত কর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং মীরজুমলার পণ্য বোঝাই নৌকা ফিরিয়ে দেয়। ফলে উভয়পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু এই শান্তি চিরস্থায়ী হয়নি।

কারণ এই ঘটনার কিছুকালের মধ্যেই মীরজুমলার মৃত্যু হয়, ফলে বাংলার শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। তাঁর জায়গায় শায়েস্তা খাঁ বাংলার শাসনকর্তা হয়ে আসেন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইংরেজদের সঙ্গে মোঘলদের সম্পর্কেও পরিবর্তন আসে।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে শোভা সিং স্থানীয় ভাবে মোঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। উড়িষ্যার আফগান শাসনকর্তা রহিম খাঁকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে অবস্থিত রাজমহল থেকে শুরু করে মেদিনীপুর পর্যন্ত প্রায় সবটাই দখল করে নেন। রাজমহল অধিকৃত হবার ফলে রাজমহলের ইংরেজদের সম্পদও লুণ্ঠিত হয়। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আজিম-উস-শানের শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োগের প্রাক্কালে তৎকালীন শাসনকর্তা ইব্রাহিম খাঁর সুযোগ্য পুত্র জবরদস্ত খাঁ রাজমহল উদ্ধার করে লুণ্ঠিত দ্রব্যের একটা অংশ নবাবের নাম করে বাজেয়াপ্ত করেন এবং ইংরেজদের ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন। তখন ইংরেজরা তৎকালীন শাসনকর্তা আজিম-উস-শানের কাছে তাদের পণ্য ফেরৎ দেবার আবেদন জানায়।

ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে মোঘল সাম্রাজ্যে দুর্বলতা দেখা দেয়। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর সেই দুর্বলতাগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ভারতবর্ষে ইংরেজদের ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাই ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজা দ্বিতীয় জেমসের কাছ থেকে বাণিজ্যিক স্বার্থে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অনুমতি প্রার্থনা করে অনুমোদন লাভ করে। এর ফলে বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে বিবাদ যুদ্ধে পরিণত হলেও ইংরেজরা সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। অবশেষে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর তারা সাফল্য লাভ করে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে যুদ্ধে তারা জয়লাভ করে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে জয় লাভের পর তারা বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার অদৃশ্য পরিচালকের ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের ফলে রাজমহলের দায়িত্ব ইংরেজদের ঘাড়ে এসে পড়ে। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত মাল পাহাড়িয়াদের মোঘলরা খুব একটা গুরুত্ব প্রদান করেননি। কিন্তু কোম্পানি আমলে তাদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে গেলে ওয়ারেন হেষ্টিংস তাদের উপর নজর দিতে বাধ্য হন।

ওয়ারেন হেস্টিংস জেনারেল বার্কারের উপদেশ ও যুক্তি মেনে ৮০০ লোকের একটা বিশেষ বাহিনী গড়ে তুললেন এবং ক্যাপ্টেন ব্রুককে তাদের দায়িত্ব দিয়ে বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি অভিযানের পর অভিযান চালিয়ে পাহাড়িয়াদের আতঙ্কিত করে তুললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দী পাহাড়িয়া এবং

তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করে তাদের মন জয় করে ফেললেন। ১৭৭২ থেকে ১৭৭৪ মাত্র দুবছরের মধ্যে তিনি তার সাধ ও সাধ্যের অতীত অনেক কিছুই করে ফেললেন।

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তার যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে রাজমহলে এলেন ক্যাপ্টেন ব্রাউন। তিনি পাহাড়িয়াদের দমন করেই ক্ষান্ত হলেন না, পাহাড়ের শান্তি যাতে চিরস্থায়ী হয় তার জন্য একটা নীল নকসা তৈরী করলেন। কিন্তু তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার আগেই তাঁকে অগাস্টস ক্লীবল্যান্ডের হাতে পাহাড়ের দায়িত্ব দিয়ে ভাগলপুরে চলে যাবার আদেশ দেওয়া হয়।

'To the memory of Augustus Cleveland, ESq. late collector of the districts of Bhaugulpore and Rajmahal, who, without blood shed the terror of authority employing only the means of conciliation, confidence, and benevolence attempted and accomplished the entire subjection of the lawless and savage in habitants of the Jungle terry of Rajmahal'', who had long infessted the neighbouring lands by their predatory in cursions inspired them with a taste for the arts of civilised life and attached to the British Government by a Conquest over their mind—the most Permanent, as the most rational mode of dominion. The Governor General and Council of Bengal, in honour of the character and for an example to others, have odered this monument to be erected. He departed this life on the 13th of January 1784, aged 29.[৫]

মাত্র ২৯ বছব বয়সে অগাষ্টস ক্লীবল্যান্ড ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু এত অল্প সময়ের ব্যবধানে তিনি যে, তাঁর কর্মক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছিলেন সেই কথাই তাঁর উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মৃতি সৌধে খোদাই করা আছে।

'ভাগলপুর এবং বীরভূমের প্রাক্তন কালেক্টর অগাস্টস ক্লীবল্যান্ড, স্কোয়ার, যিনি রক্তপাত ছাড়াই মধুর ব্যবহার, সদাশয়তা এবং বিশ্বস্ততার দ্বারা রাজমহল জঙ্গল তরাই-এর বিশৃঙ্খল এবং আদিম অসভ্য অধিবাসীদের যারা পার্শ্ববর্তী সমতলবাসীর কাছে অবাধে লুটপাট এবং আক্রমণের জন্য মূর্তিমান বিভীষিকা ছিল, তাদের সভ্যতার স্বাদ দিয়ে সভ্য হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল হবার শিক্ষা দিয়ে মন জয় করেছিলেন, তাদের মধ্যে চিরস্থায়ী এবং যথার্থ কর্তৃত্বের আস্থা অর্জন করেছিলেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে অন্যদের কাছ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরবার জন্য গর্ভনর

৫. ব্রাডলি বার্ট, হিষ্ট্রি এন্ড এথনোলজি অফ অ্যান ইন্ডিয়ান আপল্যান্ড-পৃষ্ঠা—১১১

জেনারেল এবং কাউন্সিল অফ বেঙ্গলের সাধু প্রচেষ্টায় তার স্মৃতি রক্ষার্থে এই সমাধি নির্মিত হল। তিনি ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি ইহলোক ত্যাগ করেন।'

পাহাড়ের দায়িত্ব নিয়ে ক্লীবল্যান্ড রাজমহলে চলে আসেন। পাহাড়িয়াদের সরলতা, সততা এবং সত্যবাদিতা তাঁকে মুগ্ধ করে। তাই তিনি তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বার্ষিক ২৯,৪৪০ টাকার এক পুর্নবাসন প্রকল্প তৈরি করে কোম্পানীর সদর দপ্তরে জমা দিলেন। তাঁর পরিকল্পনার রূপরেখা ছিল নিম্নরূপ:

(১) গ্রাম প্রধান বা মাঝিদের নিয়ে প্রায় ৪০০ লোকের একটি তীরন্দাজ বাহিনী গঠন, প্রত্যেক মাঝির অধীন তাঁর নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী এক বা একাধিক লোক নিযুক্ত হবে।

(২) প্রতি ৫০ জনের পিছনে এক জন গ্রাম প্রধান থাকবে এবং সে তার সংশ্লিষ্ট বাহিনীর কাছে তার সদব্যবহারের জন্য দায়ী থাকবে।

(৩) তারা ভাগলপুরের জেলা কালেক্টরের অধীনে কাজ করবে এবং তার কর্মক্ষেত্র সেখানেই হবে।

(৪) সরকারের শত্রু পাহাড়িয়াদের শত্রু হিসাবে গণ্য হবে, অবাধ্য ঘাটোয়াল এবং গ্রাম প্রধানকে তারা দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে এবং যেখানেই তার সাক্ষাত পাবে সে শত্রু হিসাবে গণ্য হবে।

(৫) প্রত্যেক পাহাড়িয়া-প্রধান যার অধীনে একটা বাহিনী আছে, মাসিক ৫৲ টাকা সাহায্য পাবে। সাধারণ মানুষ ৩৲ টাকা এবং যে সব প্রধান সাধারণ লোক সরবরাহ (বাহিনীর জন্য) করবে তারা ২৲ টাকা করে পাবে। বাহিনীর প্রধানদের সরকারের প্রতি অনুগত্যশীল হতে হবে, অসদাচরণের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

(৬) বাহিনীর প্রত্যেকেই বছরে একটা পাগড়ি, দুটো কোমর বন্ধ, দুটো জামা, দু জোড়া জাঙ্গিয়া এবং নীল বেগনি রংয়ের একটা জ্যাকেট পাবে।

এছাড়াও তিনি খালি হাতে তাদের কাছে ঘনঘন যাতায়াত করতে লাগলেন, তাদের সঙ্গে শিকারে যেতেন, দামি দামি উপহার ছাড়াও ভুরিভোজের আয়োজন করতেন। পাহাড়ের নীচে গ্রামের শেষ প্রান্তে বাজার বসিয়ে মাছ, মাংস, মধু, মোম পশুর চামড়া কেনাবেচার ব্যবস্থা করলেন। গম এবং বার্লির দানা দিয়ে কৃষিকাজে উৎসাহ দিতে লাগলেন এবং বিনা খাজনায় জমি চাষের প্রতিশ্রুতি দিলেন। এইভাবে মধুর ব্যবহার, মিষ্টি আচার আচরণ দিয়ে অল্প সময়ের ব্যবধানে তাদের হৃদয় মন জয় করে ফেললেন। সরকার তার পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে তা রূপায়িত হবার আগেই

তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন ফলে তাঁর পরিকল্পনা ফাইল বন্দী হয়ে পড়ে রইল। তাঁর পরবর্তী উত্তরসুরীরা তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে উৎসাহ দেখায়নি ফলে ক্রমে ক্রমে পাহাড়িয়াদের সঙ্গে প্রশাসকদের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। সেই খবর প্রশাসনের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কানে এসে পৌছায়; তাই ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ সাদারল্যান্ডকে ভাগলপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব দিয়ে তদন্তের আদেশ দেয়। তদন্ত শেষে সাদারল্যান্ড দামিন-ই কোহ'র সুপারিশ করে, সরকার তাঁর সুপারিশ অনুমোদন করে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন পেটি ওয়ার্ডকে সীমানা নির্ধারণের দায়িত্ব দেয়। পেটি ওয়ার্ড তাঁর সহযোগী সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন টার্নারকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সীমানা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করে। কিন্তু পাহাড়িয়ারা সেখানে যেতে অসম্মত হলে দামিন-ই-কোহ সাঁওতালদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে সাঁওতালরা এসে সেখানে সমবেত হয়।

সাঁওতালদের আগমনে নির্জন অরণ্যপ্রান্তর জেগে উঠল

সাঁওতালরা ছিলেন সৎ, সত্যবাদী এবং পরিশ্রমী। নারী পুরুষ একত্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শ্বাপদ-সংকুল বন-জঙ্গল কেটে জমি হাসিল করলেন, বাড়িঘর তৈরি করলেন। ফলে দামিন পাহাড়ের কোলে একদা জনমানবহীন, পাণ্ডববর্জিত নির্জন অরণ্য প্রান্তরে গড়ে উঠল জনপদ, গ্রাম। গ্রামের দুই পাশে সারি সারি মাটির বাড়ি। খড়ের ছাউনি। মাটির দেওয়াল। রাঙ্গা মাটির রংয়ে রাঙ্গানো মাটির দেওয়ালে লতাপাতা এবং পদ্মফুলের ছবি আঁকা। সাঁওতাল রমণীর হৃদয়ের রোমান্টিক অভিব্যক্তি সাঁওতাল রমণীরই কোমল হাতের ছোঁয়ায় মাটির দেওয়ালে ফুটে উঠেছে। আদতে এটা যে সাঁওতালদেরই গ্রাম, সাঁওতালি ভাষায় যাকে বলে আতু, এক লহমায় সেটা চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। এই আতু বা গ্রামের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগল। ডানবার সাহেবের প্রতিবেদন থেকে এই সত্যই ধরা প'ড়ে। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে যেখানে মাত্র ৪২৭টি গ্রাম ছিল ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সেই সংখ্যা বেড়ে ১,৪৭৩ হয়েছিল এবং লোক সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ৮২,৭৯৫ জন। W. W. Hunter এর লেখা ডানবারের এই সংখ্যাকে সমর্থন করে—

"Between 1838 and 1851 the Polulation within the Pillars increased from 3000 to 82,795, besides 10,000 on the out

৬, W.W. হান্টার, দি এনালস অব রুরাল বেঙ্গল—১৬১

skirts.''[৫] অর্থাৎ ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে যেখানে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩,০০০ সেখানে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সেই সংখ্যা সীমানার বাইরে অবস্থিত ১০,০০০-কে বাদ দিয়েই ৮২,৭৯৫-এ এসে পৌঁছাল।

ইংরেজি ১৭৭০ (বাং ১১৭৬) খৃষ্টাব্দে বাংলায় এক ভয়ংকর, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইতিহাসে যা ৭৬ এর মন্বন্তর নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ দুর্ভিক্ষের বিবরণ তৎকালীন বিভিন্ন লেখকের লেখায় পাওয়া যায়। বহু মানুষ দুর্ভিক্ষের বিষাক্ত ছোবলে প্রাণ হারিয়েছেন, বহু গৃহহীন, আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন। স্মরণকালের মধ্যে এমন দুর্ভিক্ষ আর দেখা যায় নি। বাংলা সাহিত্যে এই দুর্ভিক্ষের জীবন্ত বিবরণ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "আনন্দমঠ" উপন্যাসে পাওয়া যায়—

"১১৭৬ সালে গ্রীষ্মকালে একদিন পদচিহ্ন গ্রামে রোদ্রের উত্তাপ বড় প্রবল। গ্রামখানি গৃহময় কিন্তু লোক দেখি না। বাজারে সারি সারি দোকান, হাটে সাবি সারি চালা, পল্লীতে পল্লীতে শত শত মৃন্ময় গৃহ, মধ্যে মধ্যে উচ্চ নীচ অট্টালিকা। আজ সব নীরব। বাজারে দোকান বন্ধ, দোকানদার কোথায় পলাইয়াছে ঠিকানা নাই। আজ হাটবার, হাটে হাট লাগে নাই। ভিক্ষার দিন ভিক্ষুকেরা বাহির হয় নাই। তন্তুবায় তাঁত বন্ধ করিয়া গৃহপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতেছে, ব্যবসায়ী ব্যবসা ভুলিয়া শিশু ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছে, দাতারা দান বন্ধ করিয়াছে, অধ্যাপক টোল বন্ধ করিয়াছে, শিশুও বুঝি আর সাহস করিয়া কাঁদে না। রাজপথে লোক দেখি না, সরোবরে স্নাতক দেখি না। গৃহদ্বারে মনুষ্য দেখিনা, বৃক্ষে পক্ষী দেখি না. গোচারণে গোরু দেখিনা, কেবল শ্মশানে শৃগাল কুক্কুর! এক বৃহৎ অট্টালিকা—তাহার বড় বড় ছড়ওয়ালা থাম দুর হইতে দেখা যায়-সেই গৃহারণ্যের মধ্যে শৈল শিখরবৎ শোভা পাইতেছিল। শোভাই বা কি তাহার দ্বার রুদ্ধ, গৃহ মনুষ্য সমাগমশূন্য, শব্দহীন, বায়ুপ্রবেশের পক্ষেও বিঘ্নময় তাহার অভ্যন্তরে ঘরের ভিতর মধ্যাহ্নে অন্ধকার, অন্ধকারে নিশীথফুল্ল কুসুম যুগলবৎ এক দম্পতি বসিয়া ভাবিতেছে। তাহাদের সম্মুখে মন্বন্তর।"

কোথাও এতটুকু অতিরঞ্জিত করা হয়নি। কল্পনার রং মিশিয়ে রাঙানো হয়নি, ৭৬এ বাস্তবে যা ঘটেছিল তাই এখানে বর্ণিত হয়েছে। ডাবলিউ ডাবলিউ হান্টার তাঁর দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গলেও এই একই কথাই বলেছেন—

"Before the commencement of 1771, one third of a generation of peasents had been swept from the face of the earth and a whole generation of once rich families had been reduced to indignance. Every district reiterated the same fate. The revenue

farmers—a wealthy class who then stood forth as the visible government to the common people being unable to realise the land tax, were stripped of their office, their person imprisoned and their lands, the sole dependence of their families relet."[৭]

অর্থাৎ, ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের শুরুতেই প্রতিটি কৃষক পরিবারের তিনভাগের একভাগ ভূমি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলেন এবং একটা সম্পন্ন পরিবারের সবাই অভাবগ্রস্থ হয়েছিলেন। প্রতিটি জেলাই পুনঃ পুনঃ এক কথাই বলে চলেছে। খাজনা আদায়কারী সম্পন্ন কৃষক পরিবার যারা তখন পর্যন্ত সাধারণের কাছে সরকার হিসেবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, তারা জমির খাজনা আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কোম্পানী তাদের কাছ থেকে জমিদারি স্বত্ব কেড়ে, তাদের কারারুদ্ধ করে, এবং তাদের জমিদারি স্বত্ব যেটা তাদের একমাত্র সম্বল ছিল, তা অন্যকে বিক্রী করে দিয়েছিল।

তিনি আরো বলেছেন—

"Bengal had lost one third of its People and one third of its surface speedily become waste. Three years after the famine, so much land lay uncultivated that the council began to devise measures for tempting the subjects of native princes to migrate into its dominions."[৮]

অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের একভাগকে বাংলা সেদিন হারিয়েছিল এবং মোট আবাদী জমির তিনভাগের একভাগ পতিত, অনাবাদী হয়ে পড়েছিল। দুর্ভিক্ষের তিন বছর পর বাংলার এত জমি পতিত হয়ে পড়েছিল যে, কাউন্সিল পার্শ্ববর্তী স্বদেশী রাজপরিবারের প্রজাবর্গকে নিজের শাসনাধীন প্রদেশে আগমনের জন্য উৎসাহিত করবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

তিনি এখানেই থেমে থাকেন নি। আরো বলেছেন—

"The band remained untilled, and in 1789 Lord Cornwallis, after three years vigilant inquiry, pronounced, one third of the company's territories in Bengal to be a Jungle inhabitated only by wild beasts."[৯]

অর্থাৎ জমি অনাবাদী পড়ে রইল, এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ তিন বছর চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের পর বাংলায় কোম্পানীর তিনভাগের একভাগ

৭, ডাবলিউ, ডাবলিউ হান্টার-দি অ্যানলস অব রুরাল বেঙ্গল-৪০

৮, ঐ পৃ. ৪১

৯, ঐ—৫৪,৫৫

জমিকে পতিত, জঙ্গল এবং বন্য জন্তুর আবাসস্থল বলে ঘোষণা করলেন।

দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে বহু মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিলেন, বহু মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে খাবারের সন্ধানে স্থানান্তরে গমন করেছিলেন। তার ফলে একদা আবাদী জমির অনাবাদী হতে হতে ক্রমশ বনজঙ্গলে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং মানুষের পরিবর্তে সেটা বন্যজন্তুর নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছিল। একদিকে আবাদী জমি বনজঙ্গলে রূপান্তরিত হওয়া আবার অন্যদিকে দামিন-ই-কোহ্-য় পাহাড়ের দুর্ভেদ্য জঙ্গল পরিষ্কার করে বাসযোগ্য করে তোলা, মাটি কেটে চাষের জমি তৈরি করার মধ্যে সাঁওতালদের সৃজনশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে দামিনের গোটা ছবিটাই নিমেষে পাল্টে গেল। সাঁওতালদের বলিষ্ঠ হাতের ছোঁয়া পেয়ে দামিনের গোমড়া ধরিত্রীর মুখে যেন সহসা হাসি ফুটল। বন্ধ্যা, অনুর্বর প্রান্তরে দেখা দিল সবুজের সমারোহ। ক্যাপ্টেন শেরউইল দামিনের সীমানা অতিক্রম করবার সময় প্রকৃতির এই অভূতপূর্ব রূপ পরিববর্তনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে তার রোজনামচায় লিখলেন—

"This valley", wrote Captain Sherwill in 1851, viewed from any of the surrounding hills affords an admirable example of what can be done with natives, when their natural industry and perseverance are gaurded and encouraged by kindness. When Mr. Pontet took charge of the hills in 1835, this valley was a wilderness, inhabitated here and there by hillmen; the remainder was over run with heavy forest, in which wild elephants and tigers were numerous; but now in 1851 several hundred substantial Santal villagers, with a abundance of cattle and surrounded by luxuriant crops, occupy this hither to neglected spot. The hillmen have with a few exceptions retired to the hills."[৯]

অর্থাৎ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শের উইল লিখলেন, এই উপত্যকা পার্শ্ববর্তী অন্য উপত্যকার তুলনায় প্রশংসনীয়। দেশীয় মানুষের প্রকৃতিদত্ত শ্রম এবং অধ্যবসায়কে সহানুভূতির সঙ্গে উৎসাহ প্রদান এবং গার্ড দিলে এক স্বর্গীয় অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে—এটা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ পন্টেট যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন এটা ছিল বন্য স্বভাবের এবং বনের এখানে-ওখানে কিছু পার্বত্য উপজাতির বাস। অন্য অংশ ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল, সেখানে অসংখ্য হাতি এবং বাঘ ছিল। কিন্তু আজ এই ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে এতদিন পর্যন্ত অবহেলিত জমিতে কয়েকশত সাঁওতালদের বাস, চতুর্দিকে মূল্যবান ফসল

৯. এল, এস, এস, ও, ম্যালি-ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার সাঁওতাল পরগণা, পৃষ্ঠা—৫৪/৫৫

এবং প্রচুর পরিমাণে গৃহপালিত পশু, গোরু এবং মোষের পাল। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া পার্বত্য উপজাতির লোকেরা সেখান থেকে পালিয়ে গেছে।

"সাঁওতালদের বলিষ্ঠ হাতের ছোঁয়ায় দামিনের চেহারায় আমূল পরিবর্তন"

ইংরেজিতে একটা বহুল, প্রচলিত প্রবাদ আছে "Morning shows the day" অর্থাৎ দিনটা কেমন যাবে সকালেই তা টের পাওয়া যায়। ইংরেজদের এই আপ্ত বাক্যটি যে, সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল দামিন-ই-কোহ। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ করেছি যে, কুমারী মাটির হাতছানি পেয়ে সাঁওতালরা বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে দামিন-ই-কোহ-য় এসে জড়ো হয়েছেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অসাধ্য সাধন করেছেন। প্রাণ হাতে নিয়ে দুর্ভেদ্য জঙ্গল পরিষ্কার করে মাথা গোঁজার ঠাঁই বানিয়েছেন। উদর পূর্তির জন্য চাষের জমি তৈরি করেছেন। রোদে পুড়ে জলে ভিজে সেই চাষের জমিতে লাঙ্গল দিয়ে ধানের চারা বুনেছেন। সবুজে, সবুজে ভরিয়ে দিয়েছেন চতুর্দিক। হাড় ভাঙ্গা খাটুনির শেষে বাড়ি ফিরে আকণ্ঠ হাঁড়িয়া গিলে ক্লান্ত অবসন্ন দেহটাকে চাঙ্গা করে মাঝি আখড়ায় গিয়ে সবাই একত্রিত হয়ে নাচে গানে মশগুল হয়ে উঠেছেন। সেদিনের কথা স্মরণ করে ছটরায় দেশ মাঞ্জহি লিখেছেন—

সুর লাঁগড়ে
হানা ঘুটু পোর কুটাম
নওয়া ঘুটু সিয়োঃক
লিতাই, লিতাই হার টুটি গেল।
হামারে ঘরের ঘিরণী
দানা পানি নাই হে
মাঁড়ি বকাঃক টুটি গেল
আশা ছুটি গেল
লিতাই লিতাই হার টুটি গেল।।[১০]
ঐ মাঠে ঝোপ জঙ্গল কাটতে হচ্ছে
এই মাঠে লাঙ্গল করতে হচ্ছে

১০. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতাল গনসংগ্রামের ইতিহাস—পৃ ২২

নিতে নিতে হাল ভেঙ্গে গেল।
আমার ঘরের গিন্নী দানা পানি নাইহে
রান্নার হাতা ভেঙ্গে গেল
আশা ফুরালো
নিতে নিতে হাল ভেঙ্গে গেল।।

এইভাবে নাচতে নাচতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে প্রকৃতির সন্তান প্রকৃতির কোলে মাথা রেখে ঢলে পড়ত। পরদিন প্রাতে ঘুম ভাঙ্গতে আবার কাজে চলে যেত। সারাদিন মাঠে কাটিয়ে দিনান্তে বাড়ী ফিরে আবার আনন্দে মেতে উঠত। এইভাবেই কাজ, আবার কাজের অবসরে নাচ, গান। কিন্তু তাদের এই সুখ বেশিদিন সইল না। অচিরেই তাদের জীবনে নেমে এল অভিশাপ। খেঁকশিয়ালির পেছন পেছন যেমন ফেউ থাকে তেমনি সাঁওতালদের পেছনে পেছনেও এল মানুষরূপী হায়নার দল। শান্ত নিরীহ সাঁওতালদের সম্পূর্ণ বিপরীত এদের চরিত্র। ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার এদের (সাঁওতাল) বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"Unlike the Hindu he never thinks of making money by a stranger, scrupulously avoids all topics of business, and feels pained if payment is presant up on him for the milks and fruits which his wifes brings out. When he is at last prevailed upon to enter upon business matters, his dealings are off hand; he names the true price at first, which a lowlander never does, and politely waives all discussion or beating down."[১১]

অর্থাৎ হিন্দুদের মত অপরিচিতের কাছ থেকে পয়সা নেওয়ার কথা সে চিন্তাই করে না। পয়সা দিয়ে কেনাবেচার কথা সে ইস্ততত করে এড়িয়ে যেত। কিন্তু কেউ যদি তার বউ-এর থেকে আনা দুধ অথবা ফলমূলের জন্য পয়সা দিতে চাইত, তবে তার জন্য সে কষ্ট পেত। কিন্তু যখন সে আদান-প্রদানে সচেষ্ট হত, তখন সে ঝাড়া হাত-পা হত এবং প্রথমেই দ্রব্যের সঠিক মূল্য চাইত যেটা নাবালের অধিবাসীরা কখনো করত না এবং দর কষাকষির হ্যাপা বিনম্র চিত্তে এড়িয়ে যেত অথবা পুরোটাই বাদ দিয়ে দিত।

তিনি আরো লিখেছেন—

"He would much rather that strangers did not come to his village; but when they do come, he treats them as honoured guests. He would in a still greater degree prefer to have no

১১. ডাবলিউ, ডাবলিউ, হান্টার, দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল—পৃ-১৫০

dealings with his guests; but when his guests introduce the subject, he deals with them as honesty as he would with his own people.''[১২]

অর্থাৎ কোনো অপরিচিতের তাদের গ্রামে না আসাকেই সে পছন্দ করত, কিন্তু যদি তারা এসে পড়ত, তবে সে তাদের সম্মানীয় অতিথি হিসেবেই মনে করত অতএব তাদের সঙ্গে কারবার করাকে অপছন্দ করত। কিন্তু তারা যদি কথা তুলত তবে তাদের সঙ্গে সে নিজেদের লোকেদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করতে হয় সেরকমই ব্যবহার করত।

অপরদিকে দামিন-ই-কোহ্-য় আগত বহিরাগতরা ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তারা ছিলেন প্রকৃত অর্থেই হায়না। বর্ধমান, বীরভূম এবং ভাগলপুর থেকেই এরা মূলত দামিন-ই-কোহ্-য় এসে ঘাঁটি গাড়লেন। এঁদের কেউ ছিলেন মহাজনী কারবারী অর্থাৎ সুদের বিনিময়ে টাকা ধার দিতেন আবার কেউ ছিলেন নিছক ব্যবসায়ী। সাঁওতালদের পরিশ্রমে গড়ে ওঠা অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এদের নেক নজরে ছিল। এই প্রাকৃতিক সম্পদকে নির্বিচারে লুঠের আশায় এরা সঙ্গে নিয়ে এলেন রংবাহারি মনোহারী দ্রব্যের পসরা। দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে সাঁওতালদের জীবনের চাহিদাও বদলে যেতে লাগল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল

জমিদাররাও খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরাও জমিদারী ব্যস্থার অন্তর্ভূক্ত সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অবশেষে লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসের ২২ তারিখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন। লর্ড কর্নওয়ালিশ যখন ইংল্যান্ড থেকে কোম্পানীর গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব নিয়ে ভারতবর্ষে আসেন তখন লন্ডনস্থিত কোম্পানীর ডাইরেক্টর সভা তার পূর্বসুরী গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার ফলে তাঁকে জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিশ নিজেও ছিলেন একজন ভূম্যধিকারী। তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষেও ইংল্যান্ডের অনুরূপ একদল ভূম্যধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে। তাই ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে জমিদারদের প্রথমে দশ বছরের জন্য জমিদারী বন্দোবস্ত করা হয়। সঙ্গে এই কথাও বলে দেওয়া হয়েছিল

১২. ঐ পৃষ্ঠা—১৫০

যে, যদি ডাইরেক্টর সভা অনুমোদন করে তবে দশশালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত হবে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর লর্ড কর্নওয়ালিশ ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন লাভ করলে সেই দশশালা বন্দোবস্তকেই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষণা করলেন এবং বাঙলা প্রেসিডেন্সির বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায় এই প্রথা চালু হয়।

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলেও ত্রুটিমুক্ত হতে পারেনি। আসলে নানা তর্জন-গর্জনের পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অশ্ব-ডিম্বই প্রসব করেছিল। এই ব্যবস্থার ফলে জমির উপর জমিদারদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে রায়তদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত এবং খাজনা নির্ধারণের তাঁরা একচ্ছত্র অধিকারী হন, পরিণামে নির্বিচারে রায়তদের উচ্ছেদ এবং জমির খাজনা নির্ধারিত হতে থাকে। জমির খাজনা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমির জরিপ ও উৎপাদিকা শক্তির কথাও বিবেচিত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ এই প্রথায় নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বেই খাজনা জমা দিতে হত, যেটাকে Sun set law প্রথা বলা হয়, যে কারণে জমিদারদের জমিদারী বাঁচাবার জন্য জুলুমবাজি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তৃতীয়তঃ আদায়ীকৃত মোট রাজস্বের ৮৯% শতাংশ সরকারকে দিতে হত। অবশিষ্ট জমিদারের প্রাপ্য ছিল তার জন্য জমিদাররা যতটা সম্ভব রায়তদের কাছ থেকে বেশি খাজনা আদায়ের চেষ্টা করতেন। নির্ধারিত বন্দোবস্তের বাইরে যদি কোনো জমির সংস্কার জমিদার করতেন তার খাজনা জমিদারের প্রাপ্য ছিল। চতুর্থত, জমিদারী হস্তগত করার পর জমিদাররা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে এসেছিলেন। জমির খাজনা আদায়ের ভার পড়েছিল নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি কর্মচারীদের উপর। তাঁরা "রাজা যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ" এর ন্যায় রায়তদের কাছে নিজেদের উপস্থিতি সদর্পে জাহির করতেন।

প্রথমদিকে রাজস্বের বিরাট বোঝা অনেক জমিদারই বহন করতে না পেরে জমিদারী হস্তান্তরিত হয়েছিল। এইসব নব্য জমিদার শ্রেণী রায়তদের কাছ থেকে পূর্বতন হারে রাজস্ব আদায়ের মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না।

উপরোক্ত ব্যবস্থাদির ফলে রায়তদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়েছিল। তারা চরম দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই ব্যবস্থা যে ত্রুটিমুক্ত ছিল না, ইংল্যান্ডের ডাইরেক্টর সভাও ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এটা প্রবর্তন না করে পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

দামিন-ই-কোহ বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই সেখানকার কৃষকরাও জমিদারদের নির্যাতন নিপীড়ন থেকে রেহাই পায়নি। এল, এস, এস, ও ম্যালির, বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ারে সাঁওতাল পরগণায় তারই ঝলক দেখেতে পাওয়া যায়—

"These lands had been settled with them by the original Zamindars on long leases at easy rates that they might reclaim jungle. As cultivation extended, the Bengalies and other foreigners induced the santals to sell some of their surplus lands. They thus gradually extended their holdings, and finally secured the best lands in the village by exacting mortgages from the improvident santals in return for loans. Many of the Santals were consequently driven to commence life again by clearing fresh jungle and founding new villages, to be again ousted by their more astute and unscrupulous neighbours. Several old ghatwali and petty landholders having also got into difficulties, their estate were sold and passed into the hands to the Dikus. In some cases again, old families became indebted to Bengalis and executed usufructuary mortgages of their estates for a term of years on the understanding that the mortgages would pay the government revenue. The latter however willfully omitted to pay the revenue, and the result was that the land was declared a defaulter and his estate sold, the mortgagee himself eventually becomming a benami purchaser. As long as old proprietors remained, the santals were well treated, but after the advant of Bengalis, and other land speculators, no consideration was shown to them. The new landlords were nonresident; they rack rented the ryots, and the latter in despair gave up their leases and were replaced by strangers."[১৩]

অর্থাৎ যাতে তারা পুনরায় জঙ্গল হাসিল করতে পারে তাই তাদের দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে সহজ শর্তে মূল জমিদার কর্তৃক জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। কৃষিকার্যের পরিধি বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি এবং অন্য বিদেশিরা সাঁওতালদের তাদের কিছু উদ্বৃত্ত জমি বিক্রি করতে বাধ্য করেছিল। এইভাবে ধীরে ধীরে তাঁরা তাদের দখল বাড়িয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত অদূরদর্শী সাঁওতালদের ঋণের বিনিময়ে বন্ধকীকৃত গ্রামের ভাল জমিটাই হাতিয়ে নিয়েছিল। এইভাবে বহু সাঁওতালকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে পুনরায় জঙ্গল পরিষ্কার করে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সেখান থেকেও পুনরায় তাদের তুলনায় ধূর্ত এবং খুঁতখুঁতে প্রতিবেশীরা উৎখাত করেছিল। পুরোনো ঘাটোয়াল এবং নিকৃষ্ট ভূম্যধিকারীরাও অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাদের জমিদারী বিক্রি হয়ে

১৩. এল. এস. এস. ও, ম্যালি, বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ার' সাওতাল পরগনা পৃ-৫৬

দিকুদের হস্তগত হয়েছিল। অন্যদিকে আবার পুরানো জমিদার বাঙালির কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে তাদের জমিদারী বছরের জন্য বন্ধক দিতে বাধ্য হয়েছিল এই শর্তে যে বন্ধকগৃহীতা সরকারকে জমির খাজনা মিটিয়ে দিবে। কিন্তু তিনি জমির খাজনা না মিটিয়ে দিলে জমিদারকে অনাদায়ী ঋণগ্রস্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং বন্ধকগৃহীতা নিজেই জমিদারীর বেনামী ক্রেতা হয়ে গেলেন। যতদিন পুরোনো জমিদার থাকতেন ততদিন সাঁওতালদের সঙ্গে সদ্ব্যব্যবহার করতেন। কিন্তু বাঙালি এবং অন্য আগন্তুকদের আগমনে তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনা জুটত। নব্য জমিদাররা ছিলেন ভিনদেশীয়, রায়তদের কাছ থেকে যথা সম্ভব খাজনা আদায় করতেন। ফলে রায়তরা বাধ্য হয়ে লীজ ছেড়ে দিতেন এবং নবাগতদের দিয়ে সেই জায়গা পূরণ করা হোত।

যদিও প্রথমে বলা হয়েছিল, জমির খাজনা লাগবে না, কিন্তু বাস্তবে জমির খাজনা ক্রমাগত বাড়ানো হয়েছিল। তাঁদের উপরে দফায় দফায় নির্যাতন নিপীড়ন চালানো হয়েছিল। ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার লিখেছেন :

"The Policy of the Government, wise and beneficial as it was benevolent, allowed a Santhal to lease a new patch for three years, rent free; after which the assessement for the next three years was hardly more than nominal, and entire village paying from 3 Rs to 10 Rs. per annum as revenue; while at the end of that further period a five year settlement was made at such rate as the Santhals themselves agreed to conclud it, being in no case higher than. 8 As. and usually not more than 2 As per Bigha. The consequence has been that from 1837 to the last year there has been year by year a steady and large increase of revenue from Rs. 6682, in 1837–38 to Rs 58, 033."[১৪]

অর্থাৎ সাঁওতালদের তিন বছর বিনা খাজনায় জমি ভোগ করার অধিকার দিয়ে সরকার বুদ্ধিমান, উপকারী এবং মহানুভবতার পরিচয়ই দিয়েছিলেন। তিন বছর পরে জমির মূল্যায়নের ভিত্তিতে নামমাত্র খাজনা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন গোটা গ্রামে মিলিতভাবে বছরে ৩টাকা থেকে সর্বাধিক ১০ টাকা খাজনা ধার্য হয়। এই ব্যবস্থার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর সাঁওতালদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের বহনযোগ্য সর্বাধিক ৮ আনা প্রতি বিঘায় ২ আনার বেশি কিছুতেই নয়। কিন্তু বাস্তবে ১৮৩৭ থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে বিরাট পরিমাণ

১৪. ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার, দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল, পরিশিষ্ট পৃ-৩৭১

রাজস্ব ১৮৩৭-৩৮ এর ৬,৬৮২ থেকে বিগত বছরে খাজনার পরিমান দাঁড়িয়েছিল ৫৮,০৩৩ টাকায়।

খাজনা বৃদ্ধির এই হারকে কালী কিংকর দত্ত-ও সমর্থন জানিয়েছেন:— তিনি লিখেছেন :

"In 1838 the annual ground rent of the DAMIN-I-KOH amounted to 2,000 rupees and the number of Santal villages to nearly 40," with a population of (3000) three thousand souls." But by 1851 Mr. Pontet raised the annual rent to Rs 43,918-13-$5\frac{1}{2}$ and the number of Santals, who were "Induced to immigrate into the valleys and into the DAMIN-I-KOH" increased to 82, 795 souls living in 1,473 villages of which only 1,164 paid rent.[১৫]

অর্থাৎ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে দামিন-ই-কোহ্-য় বসবাসকারী ৪০টি গ্রামের ৩,০০০ মানুষের জমির খাজনা ছিল মাত্র ২,০০০ টাকা। কিন্তু মিঃ পন্টেট (দামিন ই-কোহর সুপরিটেনডেন্ট) ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই সেটা বাড়িয়ে ৪৩, ৯১৮ টাকা ১৩ আনা $5\frac{1}{2}$ পাই করেছিলেন তখন পার্বত্য উপত্যকা এবং দামিন-ই কোহ্য় বহিরাগত সাঁওতালদের সংখ্যা ছিল ৮২,৭৯৫জন আর গ্রামের সংখ্যা ছিল ১,৪৭৩টি তার মধ্যে ১,১৬৪টি গ্রাম জমির খাজনা দিত।

সাঁওতাল কৃষকদের কাছে জমি ছিল প্রাণের চেয়েও প্রিয়। সেই জমিকে তাঁরা তিল তিল করে গড়ে তুলেছে। জমিদারদের লোলুপ দৃষ্টি সেই জমির উপরে পড়েছিল। তাই সেখান থেকে সাঁওতালদের উচ্ছেদের অভিপ্রায়ে তাঁদের হাতি, ঘোড়ার বাঁধন খুলে দিয়ে মাঠের ফসল নষ্ট করাতেন যাতে তার খাজনা বাকি পড়ে যায় এবং জমির স্বত্ব নষ্ট হয়ে যায়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কে. কে. দত্ত লিখেছেন :—

"Wilful and uncharitable tress pass by the rich by means of their untethered cattle, tattoos, onies and even elephants on the growing crops of the poor race; and such like illegalities have been prevalent."[১৬]

অর্থাৎ ধনীরা তাদের গরু, ছাগল, মহিষ, টাট্টু ঘোড়া এমনকি হাতির বাঁধন খুলে দিয়ে ইচ্ছাকৃত এবং নির্দয়ভাবে হতভাগ্য দরিদ্র সাঁওতালদের ক্ষেতের

১৫. কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনসারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭ পৃ-৩
১৬. কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনসারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭ পৃ—৮

পাকা ফসল নষ্ট করাত। এই ধরনের অবৈধ কার্যকলাপ দামিন-ই-কোহয় প্রচলিত ছিল।

জমিদার কর্তৃক জমির ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি করা, জমির ফসল আত্মসাৎ ইত্যাদির কারণে দামিনের সাঁওতাল চাষীরা জর্জরিত হয়েছিলেন।

"পুকুর চুরি"

পূর্বরেলের বারহাওরা রেল স্টেশনের ১৩ মাইল দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত বারহেট তখনকার দিনে একখানা বর্ধিষ্ণু শহর এবং প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। দামিনের সর্বেসর্বা জেমস পটেন্টের সদর দপ্তর এখানে ছিল। বারহেটে সপ্তাহে দু'দিন হাট বসত। এইসব অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বারহেটের চারপাশে অবস্থিত গ্রামগুলিতে বাস করতেন। আর এই বারহেট থেকেই বিরাট পরিমাণে ধান, চাল, সরষে তিল, তিসি, বোরা প্রভৃতি শস্য গরুর গাড়ীতে বোঝাই, হয়ে জঙ্গীপুর থেকে ভাগীরথী হয়ে মুর্শিদাবাদ এবং সেখান থেকে কলকাতা হয়ে লন্ডনে রপ্তানি হত।

বলা বাহুল্য এসব পণ্য দামিন-ই-কোহ-র সাঁওতালদের কাছ থেকেই সংগৃহীত হত এবং ব্যবসায়ীরাই এসব সংগ্রহ করতেন। বিনিময়ে সাঁওতালদের দেওয়া হত সামান্য কিছু অর্থ অথবা অর্থের পরিবর্তে তামাক, লবণ, কাপড় চোপড়ের মত নিত্য ব্যবহার্য পণ্য। যদি কেউ এই অন্যায়ের মৃদু প্রতিবাদ করত তাকে বলা হত যে. লবণ হচ্ছে সরকারি দ্রব্য আবগারি শুল্ক দিতে হয়। ব্যবসায়ীরা পণ্য কেনাবেচায় দু' রকমের বাটখারা ব্যবহার করতেন। একটা বাটখারা কেবল পণ্য ক্রয়ের জন্য, যেটা স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি ওজনের তাকে বলা হত কেনারাম বা বড় বৌ এবং অন্য বাটখারাটা ছিল স্বাভাবিকের তুলনায় একটু কম ওজনের তাকে বলা হত বেচারাম বা ছোট বৌ। এটা কেবল পণ্য বিক্রীর জন্যই ব্যবহৃত হত। আধুনিক জীবন যাত্রার এতসব জটিল নিয়মকানুন তারা তখনও রপ্ত করে উঠতে পারেনি। কিন্তু কোথাও একটা গোলমাল হচ্ছে এটা তারা বুঝতেন। তাই পণ্য বিক্রি করতে গিয়ে যখন তারা বিশ কথাটা শুনতে পেতেন না তখন বাবুকে বলতেন বিশ বোল বাবু বিশ বোল। কিন্তু বাবু বিশ কোনোদিনই বিশ বলতেন না, তা সে যত পণ্যই থাকুক। মুখে এটুকু অনুরোধ ছাড়া প্রতিবাদের ঝামেলায় তারা যেতেন না কারণ সৎ, সদাচারী বলে তো কেউ ছিলেন না। সবাই অসৎ, অসাধু। তাই নির্বিবাদে এসব মেনে নেওয়া ছাড়া সাঁওতালদের করবার মত কিছুই ছিল না।

সঞ্চয় কাকে বলে সাঁওতালরা জানতেন না। ভবিষ্যতের চিন্তা তাদের ছিল না। কারণ তারা প্রকৃত অর্থেই খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ, পরিশ্রমী। তাই যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আনন্দের আতিশয্যে প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশিই খরচ করে ফেলতেন। ভাঁড়ারে টান পড়লেই মহাজনের বাড়ী ছুটতেন। মহাজন যা দিতেন তার কয়েকগুণ বেশি লিখিয়ে নিতেন। সাঁওতালরা সেটা ঘুণাক্ষরেও টের পেতেন না।

বৎসরের শেষে চাষীর গোলায় ধান উঠে যাবার পর মহাজন গরুর গাড়ীতে করে অথবা ঘোড়ায় চেপে বাৎসরিক অভিসারে বেরিয়ে খাতকের বাড়িতে উঠতেন। মহাজনের থাকা-খাওয়ার সমস্ত দায় গৃহস্থকেই বহন করতে হত। সেদিনের কথা স্মরণ করে সাঁওতালরা গান রচনা করলেন—

দে বয়হা হিজুঃক পে
দেলা বয়হা নাতেন পে
হায়রে হায়রে! ভগত কেনারাম
ঘোড়ার উপর পালান উপর
সওয়ারালাং কেনারাম
কুলহি। কুলহি যাইছে টাপ, টাপ।[১৭]

এস ভাই এস শুন
হায় হায়! ভগত কেনারাম
ঘোড়ার পিঠে জিনেব উপর
সওয়ারী কেনারাম
রাস্তায় রাস্তায় টগবগিয়ে যায়

গ্রামে ঢোকবার আগে রাস্তা থেকে একখণ্ড পাথর কুড়িয়ে তাকে খাঁটি নির্ভেজাল প্রমাণের জন্য তার গায়ে সিন্দুর মাখিয়ে (লেপে) দেওয়া হত। সেই সিন্দুর মাখানো পাথর দাঁড়ি পাল্লায় চাপিয়ে গৃহস্থের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হত। সর্বস্ব কেড়ে নেবার পরেও যখন খাতকের ঋণ শোধ হত না, কিন্তু দেবার মত কিছুই আর অবশিষ্টও থাকত না তখন সে বন্ধক দিত নিজেকে এবং এইভাবে সে মহাজনের ক্রীতদাসে পরিণত হত।[১৮] বিনা পারিশ্রমিকে মহাজনের

১৭. ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস—পৃ. ৫৬

১৮. The santal thus became a Kamiya i.e. the bond servant of his creditor. The effects of this system may be realised from the remarks of the (later sir) William Le fleming Robinson I.C.S. Who in 1858 secured its abolition in the santal parganas It was called Kamiotee, but it is not peculiar to sonthalia or sonthals. You will find it nearly all over the country, I believe,

বাড়িতে সে কাজ করতে, খাটতে বাধ্য হত। খাটতে খাটতে তাঁর জীবন শেষ হয়ে যেত। তাঁর উত্তর পুরুষের কাছে উত্তরাধিকার হিসেবে সে একটা জিনিসই রেখে যেত, সেটা হল দেনা, মহাজনের ঋণ। সেই ঋণ যেটা তাঁর জীবদ্দশায় সামান্য কিছু ছিল তাঁর মৃত্যুর পর সেটা চক্রবৃদ্ধি হারে কয়েকগুণ বেড়ে যেত। তাঁর বংশধর যে তাঁর বাবার কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে মহাজনের ক্রীতদাসত্ব পেয়েছে সেও খাটতে খাটতে জীবন শেষ করে দিত কিন্তু দেনা শোধ হত না। এইভাবে তাঁরা বংশ পরম্পরায়, বংশানুক্রমে ক্রীতদাসে পরিণত হত। যদি সে কাজে ফাঁকি দিত মহাজন তাঁর খাবার বন্ধ করে দিত, যদি সে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে পরিত্রাণের চেষ্টা করত, মহাজন সেটা পূবাহ্নেই অনুমান করে কোর্ট থেকে পয়সার বিনিময়ে সমস্ত অস্থাবর, স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে নিত। এমনকি স্ত্রী লোকের হাতের সস্তার লোহার বালা যেটা তার সম্ভ্রমের প্রতীক সেটাও বাদ যেত না। অসহায় সাঁওতাল শুধু আকাশ পানে চাইত আর বিড় বিড় করত, ভগবান তুমি মহান! কিন্তু অনেক দূরে থাক।

বিচার ব্যবস্থা তার নাগালের বাইরে ছিল। সামান্য ছোটো-খাটোর বিচার কাছাকাছি হলেও, বড় কিছুর জন্য ভাগলপুরেই ছুটতে হত, সেটা দামিন-ই-কোহ থেকে দূরেই বলা যায়। আবার ভাগলপুরে বিচারালয় থাকলেও আর্দালি থেকে শুরু করে হাকিম পর্যন্ত সবাই চোর দুর্নীতিগ্রস্ত ছিলেন। সেখানে ন্যায় বিচার দূর অস্ত, বিচারের নামে হত প্রহসন, পুকুর চুরি। ফলে "নীরবে নিভৃতে কাঁদত বিচারের বাণী।" প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কালী কিংকর দত্ত সে কথাই বলেছেন—

---

in one form or another. But in sonthalia it was very bad. A man borrowed money and gave a bond to work it out, binding himself to work for the lender, when ever he was required, without pay. The lender of course required his services at harvest and the other busy seasons of the year, when the debtor could have got work and pay else where and when work was slack, the lender of course did not required his slave services. He could make nothing elsewhere, all he got when working was food, and sometimes a bit of cloth once a year. As interest was taken in advance, the debtor could never work out his debt; the interest was never less than 25 percent, often much more. The son, daughter or other nearest relation of the debtor used in case of his death to be consider liable, and if suits were brought against these bonds in the old munsiffs courts, they used to give decrees for their due execution; no matter how old the debt or who was working it out at the time. I have had a bond brought to me in which Rs 25 was originally borrowed by a man who worked his lifetime, his son did ditto, and I released his grandson from any further necessity; it had been running on for over thirty years, if I remember rightly!" (L.S.S.O. Malley, Bengal district Gazetters. P-57)

The superintendent sometime decided petty cases, but for important ones the Santals had to go to the courts at Bhagalpur. Even by undertaking a trouble some Journey to the court of Justice. Situated at a considerable distance from home, a Santal could not always expect justice because of the various artifices practiced by the cunning AMLAHS, MUKHTEERS, PEONS and BAR KANDAZES. Further, while "he found justice in the shape of the magistrate so far off and so terribly difficult of access, he found justice nearer home in the shape on Darogahs and thannah police, the authorised agents of the District Magistrate, but found it only to find it is bane."[১৯]

অর্থাৎ সুপারিনটেন্ডেন্ট কখনো কখনো তুচ্ছ বিষয়ের বিচার করলেও, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য সাঁওতালদের ভাগলপুর আদালতেই যেতে হত। ভাগলপুর তার বাড়ি থেকে দূরেই ছিল। পায়ে হেঁটে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে কোনোরকমে ভাগলপুর পৌঁছলেও ন্যায়বিচার পাবার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। কারণ কোর্টের আমলা, মুখতিয়ার, পিয়ন এবং বরকন্দাজ সবাই দুর্নীতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আবার মাঝে মাঝে যদিও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে ন্যায় বিচারের দেখা মিলত কিন্তু ভয়ে সে সেখান থেকে দূরেই থাকত। তার বাড়ির সন্নিকটে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ দারোগা এবং থানা-পুলিশের ন্যায় বিচারের যা ছিরি দেখা যায়, তা মৃত্যুরই নামান্তর।

"শান্ত দামিন-ই-কোহ'য় অশান্তি দেখা দিল

জায়গা হিসেবে দামিন-ই-কোহ চিহ্নিত হয়ে গিয়ে ছিল যেখানে কোনো রকমে পৌঁছাতে পারলেই কয়েক বছরের পরিশ্রমে ভাগ্যকে ফেরানো যায়। আর মানুষ হিসেবে সাঁওতালরাও চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন সোনার ডিম পাড়া হাঁস হিসেবে। কিন্তু একটা জায়গায় গোল দেখা দিল, তা হচ্ছে এই যে, এই হাঁস রোজ মাত্র একটা করেই ডিম দেয়। তাই হাঁসটাকে মেরে তার পেট চিরে সব সোনার ডিম এক সঙ্গে হস্তগত করবার চেষ্টা হল।

ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যে এ পর্যন্ত বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। তারা সবাই মানুষকে সৎ পথে চলবার, সত্য কথা বলবার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু মানুষ 'চন্দনের টিপ ভালে ফুলমালা গলে' দিয়েছেন বটে কিন্তু

১৯. কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনসারেকশন, পৃ-৩

তাদের অন্তর নোংরায় পরিপূর্ণ। অপরদিকে সাঁওতালদের মধ্যে এযাবৎ কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব না হলেও সাঁওতালরা সৎ এবং সত্যবাদী। এটা তার সহজাত প্রবৃত্তি। দামিন-ই-কোহ-র সাঁওতাল কৃষকরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন শুদ্ধ মানবতার পূজারী। এছাড়াও তাঁরা ছিলেন সরকারের অনুগত এবং ভিনদেশীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রতিবেশীসুলভ আচার-আচরণে বিশ্বাসী। বিনিময়ে তারাও তাদের ভিনদেশীয় প্রতিবেশীদের কাছ থেকে অনুরূপ আচরণ প্রত্যাশা করেছিল। সেটা কি অন্যায় ছিল? মোটেই না। কিন্তু তার ভিন দেশীয় প্রতিবেশীরা প্রতিবেশীসুলভ আচার-আচরণের পরিবর্তে তাঁকে আঘাত করেছিল। খোঁচা মেরেছিল। ক্রমাগত খোঁচা মেরে মেরে তার ঘুমন্ত (Dormant) আদিম প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল। তাই এতদিন পর্যন্ত যারা শান্ত, আপাত নিরীহ বলে পরিচিত ছিল, যারা গোরা পল্টনের বুটের গুঁতো খেয়েও রা কাড়ত না, তারাই গর্জে উঠল, অস্ত্র হাতে তুলে নিল। তাদের সেই গর্জন দামিন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে দামিন-ই-কোহ-র পাদদেশে অবস্থিত সাঁওতাল পল্লীতে ফিরে এল, এবং দামিনের সাঁওতাল পল্লীর আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে লাগল। জোতদার, জমিদার নিপাত যাক, নিপাত যাক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দূর হটো। মহাজনের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও ইত্যাদি। শান্ত দামিন-ই-কোহ-য় অশান্তি দেখা দিল। ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টারের কথায় ভারতবর্ষের সব থেকে শান্তিপূর্ণ অঞ্চলেই অশান্তি দেখা দিল।

Early in 1855, the most peaceful province in the empire became the scene of a protracted rebellion.''[২০]

অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের গোড়ার দিকে কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত সর্বাধিক শান্তিপূর্ণ অঞ্চলেই দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহ দেখা দিল।

দেখতে দেখতে দামিন পাহাড়ের নীচে অবস্থিত গ্রামগুলি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় থাকা আগ্নেয়গিরির চেহারায় পরিবর্তিত হয়ে গেল। এমতাবস্থায় যেটা অবশ্যম্ভাবী এবং সর্বত্রই ঘটে থাকে সেটা হল গুজব। এক্ষেত্রেও তাই হল। সাঁওতালদের গ্রামগুলিতে গুজবের পর গুজব রটতে শুরু করল। সমসাময়িক সাঁওতালি সাহিত্যে এ সব গুজবের বিবরণ পাওয়া যায়। "হড়করেন মারে হাপড়াম কো রেয়াঃক কাথায়" যুগিয়া হাড়াম বলেছেন—"পাহিল দ লাগ লাগিন বিঞ দারাকিন কানা, হড়কিন উৎকওয়া। ওনা বেদ গুচাও লাগিৎ মড়ে আতোরেন জারওয়া কাতে এটাঃক মড়ে আতোকো দাঁড়ায়েয়া মিৎ ঞিদা মতরে, আডি নেও ধরম কাতে। আলেয়াঃক আতোরেন অড়াঃক অড়াঃক মিৎ হড় কাতেকো

২০. ডবলিউ, ডাবলিউ, হান্টার দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল, পৃ. ১৬০।

হেএচলেনা। মাঝি ছাটকারেক এনেএচ আচুর কেৎআ টামাক রুইতে। ডাস্তারে টটকো ঘান্টিকো তল আকাৎআ। হিলাউঃক হিলাউঃকতে ওনাদ আডি বাড়িইচ সাডেয়েনা। বারয়া ডাঁগুওয়া কড়াকিন পৈতা আকায়ওয়ানা আর বারয়া হপন হপন সিন্দুর আকাওয়াৎ নাহেল, নিম আর সিঞ্জ রেয়াঃককিন আঃকসেন কানা মিৎটেচ ডালিচরে ভরাও কাতে। আকোওয়াঃক মড়ে আতো দাঁড়া পুরাও কাতে মুচাৎ আতো টান্ডিরে আলে মড়ে আতোরেনকো জারওয়া কেৎলেয়া। অঁডেদ লাগ লাগিন এক্ততুমতে সিঞ্জ সাকাম, আদওয়া চাওলে আর সুনুম সিন্দুর ক বঁগা কেৎআ। অনাকাতে হেএচ ইদিঃক কান সেরেএক চেৎ ওট আৎ লেয়া, আদ আলেরেন বারয়া ডাঁগুওয়া কড়া পৈতা হরঃক কাতে আর নাহেলকিন চাল ওট আৎকিনতে আক আতুওয়াঃক অড়াঃকতেক চালাও এনা। খানগে আলেহঁ উনকুলেকা মড়ে আতুলে দাঁড়ায়েয়া।[২১]

অর্থাৎ প্রথমতঃ নাগ, নাগিন আসছে মানুষ গিলবার জন্য। এ বিপদ কাটাবার জন্য পাঁচ গ্রামের লোক জমায়েত হয়ে আর পাঁচ গ্রামে যেত, এক রাত ভক্তি ভরে দেবতার আরাধনা করত। আমাদের গ্রামে প্রতি বাড়িতে একজন করে তাঁরা এসেছিল। গ্রামের মোড়লের (মাঝি) বাড়ির উঠোনে ঘুরে ঘুরে নাগড়া বাজিয়ে তারা নাচতে শুরু করল। তাদের কোমরে ঘুঙুর ও ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা, নাচবার সময় সেগুলি থেকে খুব জোরে শব্দ হচ্ছিল। দুটি অবিবাহিত ছেলে পৈতা পরে, একটি ডালায় নিম ও বেল কাঠের দুটি ছোট সিন্দুর মাখানো লাঙল নিয়ে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পাঁচটি গ্রাম ঘুরে শেষ গ্রামে এক ফাঁকা মাঠে আমাদের ডেকে জড়ো করল। সেখানে বেলপাতা আতপ চাল আর সিন্দুর দিয়ে নাগ নাগিনীর পূজা করল। তারপর আমাদের দুটি অবিবাহিত ছেলেকে পৈতা পরিয়ে, লাঙল দুটি দিয়ে তারা যে যার বাড়ীতে চলে গেল। আমরাও তাদের মত পাঁচটি গ্রামে ওইভাবে ঘুরে বেড়ালাম।"

যুগিয়া হাড়ামের বিবরণ থেকে আরো জানা যায়।

অনাকাতে আরহঁ মিৎ টেচক উনান কেৎআ বাংমা, মিৎ বারাবারিক গিদরা আকাওয়ান মাইজুক সাইহাকো পাতাওমা বাবার হড় কাতে। কিচরিচ কো এপেমা, আরক জম এঞুইয়া। চেৎ ইয়াতে চং? জানিচ যতক পেড়াঃকতে মিৎ মন তাঁহেন তাক, যাঁহা লেকাতে হুল যাঁহান লেনখান আলক চুপগালিঃক আর যাঁহান কাথা হুই লেনরেঁহ উকুন বাড়ে তাহেন।

এনে বার উফার হুই এনা। আরহঁ মিৎ গটেচ উডাও এনা কাথায়, মিৎটেন বিতকিল দারায় কানা। যাঁহায় ছাটকারে ঘাঁসে এঞাম, অঁডেগে আতিএঞ কাতেয়

২১. Tradition and Institution of Santal, P.O. Bodding পৃ.-১৯০

বুরুমা। অনা অড়াঃকরেন হড় আউরিক গচ চাবাঃক হাবিচ বায় বেরেৎআ। অনা বতরতে গটা দিশম কুলহিক লাঃক কেৎআ। আদ ডোমক রেয়াঃক উফার জানামলেনা, বাংমা গাঙ নাইরে সোনা লাউকা উনুমেনা, অনাতে যত ডোমক মাঃক গচ কওয়া। ডোমকদ অনা বতরতে বির জেল (জিয়ালি) লেকাক ঞির বাড়ায় কান তাঁহে কানা, হড় লেকাক সাজলেনা, আর হড় অড়াঃকরেক তাহেনা।

খানগে উফারেনা, বাংমা লায়ো গাড়রে ডাঁগুওয়া কুড়িরে সুবায় জানামএনা, যত হড় অঁড়ে সেন্দরা লাগিৎক চালাঃকমা। লায়ো গাড়দ হাজারীবাগ খন চেতান। আদম হড়দক সেনলেনা সুবাহঁক এঞল কেদেয়া আর উনি তুলুচ কাঞ্চন বিরহঁক সেন্দরা কেৎআ। গঅচ কেৎক জিলদ মিৎঠেন জারওয়া কাতেক গেৎ কেৎ কআ। আর হড়দ জুড়ু হাতাও লাগিৎ হড়, হড় মিমিৎ গটেচ সাকামক ইদিয়ানা। অনাক সাকামক লেখা কেৎআ, এঞেল কেৎআক তিনাঃক হাজার দিশম হড়ক জারওয়া আকানা। সুবাদ যত খরচে এম কেৎআ।"[২২]

অর্থাৎ "এরপরে আরো গুজব রটল যেমন এক ছেলের মায়েরা সই পাতাবে। কাপড় দেওয়া নেওয়া করবে এবং খাওয়া দাওয়া করবে। কী কারণে যা হউক। হয়ত আত্মীয়তার বন্ধনে পড়ে সবাই এক হয়। কোনো রকমে বিদ্রোহ দেখা দিলে পরস্পরের নামে যেন কেউ কথা না লাগায় এবং কোনো কথাবার্তা হলেও তা যেন গোপন থাকে।

এ দুটির পর অপর একটি গুজব রটল যে, একটি মহিষ আসছে। যার বাড়ির উঠানেই ঘাস পাবে সেখানেই চরে বসবে। সে বাড়ির লোক মরে শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে উঠবে না। এই ভয়ে সবাই উঠানের চারপাশের ঘাস চেঁছে ফেলল।

ডোমদের সম্বন্ধে এক গুজব রটল যে, কোনো এক ডোমের ছোঁয়া লেগে গঙ্গা নদীতে সোনা বোঝাই নৌকা ডুবে গেছে। সেই জন্য সমস্ত ডোম হত্যা করে তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। ডোমেরা শিকার হবার ভয়ে বন্য জন্তুর মত পালাতে লাগল। সাঁওতালদের মত পোশাক পরত এবং সাঁওতালদের বাড়িতেই বাস করতে লাগল।

আরো গুজব রটল যে, লায়ো গড়ে কুমারী মায়ের গর্ভে সুবেদার জন্ম নিয়েছে। সাঁওতালদের সবাই যেন, সেখানে শিকার যাত্রায় যায়। লায়ো গড় হাজারীবাগ থেকে উত্তরে পড়ে। কিছু লোক সুবাদারকে দেখতে গেল, তারা তার সঙ্গে কাঞ্চন জঙ্গলে শিকারেও গেল। শিকার করা পশুর মাংস কেটে

২২, Tradition and Institution of Santals, P.O. Bodding, পৃ.-

এক জায়গায় জড়ো করা হল। সমবেত সবাই নিজ নিজ অংশ বুঝে নেওয়ার জন্য একটি করে গাছের পাতা নিয়ে এল। শিকারে কত লোক এসেছে পাতা গুনে সংখ্যাটা জানাব চেষ্টা হল। সমস্ত খরচ ঐ সুবাই দিয়েছিলেন। সবশেষে তিনি বলেছেন—

ইনাকাতে উনান এনা বাংমা চিলিচ দারাক কানা, দিকু হপন গঅচক লাগিৎ। আপেদ কুলহি মুচাৎরে মিৎটেচ ডাঙরা হারতা আর মিৎ জড় ত্রিয় আকায়পে, যাঁহা লেকাতেক বাড়ায়মা হড় কানাপে মেন্তো। বাংখান আপে সুধাগেক মাঃক গচপেয়া। অনা বতরতে আতু আতুলে আকা কেৎআ।[২৩]

অর্থাৎ "এরপর রটল যে, দিকুদের মারবার জন্য কারা যেন আসছে। তোমাদের অনুরোধ করছি কুলহির (রাস্তা) শেষ প্রান্তে একটা গরুর চামড়া এবং একজোড়া আড় বাঁশি টাঙ্গিয়ে রাখতে যাতে তারা বুঝতে পারে যে এটা সাঁওতাল (হড়) গ্রাম। ভয়ে সবাই তাই করল।

যুগিয়া হাড়াম ছাড়াও সাঁওতাল সমাজের অপর দুজন লেখক চৈতন্য হেমব্রম কুমার এবং ছটরায় দেশ মাঞ্জহি ও গুজবের কথা উল্লেখ করেছেন। চৈতন্য হেম্ব্রম কুমার তাঁর "সান্তাল পরগণা সান্তাল আর পাহাড়িয়া কওয়াঃক ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন—

উনান হেএচ এনা বাংমা, মারাং উতার জোঁক দারায় কানা, উনিদ আতুকে আতুয় দাঁড়ানা; যাঁহা আতুরে হাঁস গাড়লাঃক এ এগাম লেখান অনারেয়ে বাসাঃকআ আর অনা আতুরেন হড়দ মিৎহঁ মিৎক গঅচ চাবাঃকআ। অনা উনান আঞ্জম তরা আতু রেয়াঃক হাঁস গাড়লাঃকদ মিৎহঁ মিৎক ভাতাওকেদা, যেমন উনি জোঁক অনা আতুরে আলয় বাসাঃক।"[২৩]

অতঃপর গুজব শোনা গেল যে, একটা জোঁক আসছে। সে গ্রামের পর গ্রামে ঘুরবে, যার যেখানে গর্ত পাবে সেখানেই ডেরা বাঁধবে। তার ফলে মড়ক দেখা দেবে গ্রামে। গ্রামের সবাই মরে গেলে সে গ্রাম ছাড়বে। এই ভয়ে গ্রামের খানাখন্দ ভরাট করে দেওয়া হল। যাতে জোঁক এসে বাসা বাঁধতে না পারে।"

কথায় বলে, "গুজবে কান দেবেন না।" কারণ গুজবের পেছনে থাকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। এ সব গুজব কারা ছাড়িয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্যই বা কি ছিল আজ এতদিন পরে সে রহস্য ভেদ করা কঠিন। তবে অস্বাভাবিক একটা কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে মোটামুটি সবাই সেটা জেনে গিয়েছিল। সে যাই হোক, এই গুজবগুলি আগুনের চেয়েও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল দামিন-ই-কোহ্-র প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

২৩, ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে সাঁওতালগণ খণ্ডগ্রামের ইতিহাস—৫৬

"সরকারি প্রশাসনের নিরপরাধের উপর অত্যাচারের ফলে গণ্ডগোলের সূত্রপাত"

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শীতকাল। সে বছর সাঁওতালরা ভালই ফসল তুলেছিল। বাজারে ফসলের দামও চড়া ছিল। কিন্তু সাঁওতালরা ঠিক করে ফেলেছিল যে, তারা আর ব্যবসায়ীদের কাছে তাদের ফসল বিক্রি করবে না, তাদের কঠোর পরিশ্রমে উৎপন্ন ফসল দেশের অন্যত্র নিয়ে যেতেও দেবে না। কৃষি মজুবরাও ঠিক করেছিল আর তারা অন্যের বাড়িতে বেগার খাটতে যাবে না। এমন সময় তারা শুনতে পেল যে, লছিমপুরের অন্তর্ভুক্ত সাসানের পারগানা বীরসিং পারগানা চাঁদো বঙ্গার দেখা পেয়েছেন এবং আর্শীবাদ লাভ করেছেন। তাঁর দয়ায় বীরসিং পারগানা তুকতাক করে যে-কোনো বাড়ির লোকজনকে কাল ঘুমে এমন আচ্ছন্ন করে দিতে পারে যে, বাড়ির সর্বস্ব নিয়ে গেলেও কেউ টের পাবে না। এই কথা শুনে অনেকেই তার দলে যোগ দিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বোরিওর বীরসিং মাঝি, সিন্দরির কোলে পরামানিক এবং লছিমপুর, হাটবান্ধার ডমন মাঝি। এই ভাবে তিনি একটি শক্তিশালী দল গড়ে তুললেন। তাঁরা বীরসিং এর ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতাকে যাচাই করে দেখবার জন্য পর পর কয়েকটা বাড়িতে ডাকাতি করলেন। সে সময় লিটিপাড়ায় কয়েকজন ধনী মহাজন বাস করতেন। তাদের অন্যতম ছিলেন ইশরি ভকত ও তিলক ভকত। বীরসিং এবং তাঁর দলবল প্রথমে ভকতদের বাড়ীতে এবং পরে বাগসিসার জিতু কলুর বাড়িতে ডাকাতি করলেন। এ ছাড়াও দরিয়াপুরের কয়েকটি বাড়িতে ডাকাতি করে সফল হলেন। মহাজনদের সন্দেহ হল। তারা বীরসিং এবং তার দলবলের উপর নজরদারি শুরু করলেন। রাত্রির অন্ধকারে তাঁদের সমবেত হবার কারণ জানতে চাইলে বীরসিং-এর দলবল জবাব দিলেন বারহেটের ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত গদির শিব ঠাকুরের কাছে রাত্রে তারা পুজো দেয়। মহাজনরাও তাদের সঙ্গে পুজো দিতে চাইলে জবাব দিল যে তোরা দিকু, দিকুদের পুজো গদির মহাদেব নেয় না। এইভাবে বীরসিং এর দলবল মহাজনদের অসৎ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেয়। সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাসের লেখক ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ডাকাতির অভিযোগে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। সন্দেহ যথার্থ বলেই মনে হয়। ডাকাতির অভিযোগ মহাজনদের মনগড়া ও কল্পিত। সাঁওতালদের জব্দ করবার জন্যই তাঁরা এরূপ ফন্দি এঁটেছিল। সে যাই হোক মহাজনরা বীরসিং এবং তাঁর দলবলের সন্দেহজনক গতিবিধির কথা

দিঘি থানার দারোগা, নায়েব সুজাওয়াল ও মহেশলাল দত্তের কাছে নালিশ জানালেন এবং তাদের গ্রেপ্তর করবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু মহেশ দারোগা তাদের কথার কোনো গুরুত্বই দিলেন না। তখন মহাজনরা পাকুড়ের জমিদার রানী ক্ষেমাসুন্দরীর তৎকালীন দেওয়ান বাবু জগবন্ধু রায়ের শরণাপন্ন হলেন। জগবন্ধু রায় দারোগাকে মহাজনদের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু দারোগা দেওয়ান জগবন্ধু রায়ের কথা কানেই তুললেন না। বাধ্য হয়ে বাবু জগবন্ধু রায় বীরসিং পারগানাকে কাছারি বাড়িতে ডেকে পাঠালেন এবং ডাকাতির অভিযোগে মোটা টাকা জরিমানা করে সঙ্গে সঙ্গেই দিতে বললেন। বীরসিং ডাকাতির অভিযোগ অস্বীকার করে জরিমানা দেওয়ার অক্ষমতা জানালে রানী ক্ষেমাসুন্দরীর দেওয়ান জগবন্ধু রায় বীরসিংকে তাঁর অনুচরদের সামনেই নির্দয়ভাবে জুতো পেটা করলেন। এই ঘটনায় বীরসিং পারগানা এবং তার দলবল ভীষণভাবে অপমানিত হলেন। তাঁরা এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কয়েক জন মহাজনের বাড়িতে পর পর কয়েকটা ডাকাতি করলেন। দারোগা মহেশ লাল দত্ত ডাকাতির হাত থেকে কাছারী বাড়িকে রক্ষা করবার জন্য কয়েকজন পাঠানকে বহাল করবার জন্য জগবন্ধু রায়কে পরামর্শ দিলেন।

কুসমায় কয়েকজন ধনী ময়রা পরিবারের বাস ছিল। বীরসিং-এর দলবল একদিন রাত্রে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে ময়রাদের নিযুক্ত পাহাড়িয়া তীরন্দাজের দল তাদের দেখে পালিয়ে যায়। তখন তাঁরা বেশ কয়েকটা বাড়ীতে ডাকাতি করে চলে যায়। এর পর মহেশ দারোগার উপর ডাকাত দমনের জন্য উপর থেকে নির্দেশ আসে। মহাজনদের কুপরামর্শে মহেশ দত্ত গোচো নামের এক নিরপরাধ সাঁওতাল বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। সাঁওতালদের মধ্যে গোচো অবস্থাপন্ন ছিল। তার হেপাজতে বেশ কয়েক ঝুড়ি সোনার মোহর ও রুপোর টাকা ছিল, যাকে তারা লাটসাহি টাকা বলত। সেই টাকা মেপে দেখবার জন্য একদিন সে তার প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটা বড় ঝুড়ি চেয়ে এনেছিল। তার প্রতিবেশী কায়দা করে ঝুড়িতে একটুখানি মোম লাগিয়ে দিয়েছিল, গুজবের সত্যমিথ্যা যাচাই করবার জন্য। টাকা মাপবার সময় সেই মোমে দু-একটা টাকা আটকে গিয়েছিল এবং ব্যাপারটা সবার কাছেই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। মহাজনদের লোলুপ দৃষ্টি সেই টাকার উপরে পড়েছিল এবং সেটাকে হস্তগত করতে চেয়েছিল। দারোগা মহেশলাল দত্ত নিরপরাধ গোচোকে ডাকাতির মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তার করে বেধড়ক পেটালেন। এই ঘটনায় অনুতপ্ত ও ব্যথিত গোচো সেদিন চিৎকার করে বলেছিল, সমস্ত নিরপরাধ সাঁওতালদের গ্রেপ্তার করবার মতন কত দড়ি এই দারোগার আছে

আমি দেখব। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে দারোগা গোচোকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

এখানেই শেষ নয়, আরো আছে। লিটিপাড়ার বিজয় মাঝি একবার ঠেকায় পড়ে আমাড়াপাড়ার মহাজন কেনারাম ভগতের কাছে সামান্য কয়েক ঝুড়ি ধান নিয়েছিল। যথারীতি শোধও করে দিয়েছিল সুদ সমেত। কিন্তু কেনারাম পুনরায় ধান চাইতে গেলে বিজয় মাঝি তাকে তাড়িয়ে দেয়। কয়েকদিন পর কেনারাম পুনরায় বিজয় মাঝির বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। সঙ্গে তাঁর হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ এবং লাঠিয়াল। এ ছাড়াও জঙ্গীপুর মুনসেফ কোর্টের লালফিতা বাঁধা একজন চাপরাসি, সঙ্গে বিজয় মাঝির গরু মোষ ক্রোক করে নেবার কাগজপত্র। কাগজ দেখে বিজয় মাঝি "থ"। চাপরাসির সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি শুরু হল। চাপরাসি বিজয় মাঝির কোনো কথায় কর্ণপাত না করে কেনারামের কথা মত গোরু-মোষ ক্রোক করতে চাইলে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। ইতিমধ্যে খবরটা গ্রামে রটে যায়। গ্রামের লোকজন তাঁদের মাঝিকে বাঁচাবার জন্য ছুটে আসে। কেনারামের দল অবস্থা বেগতিক দেখে সেদিনের মত পালিয়ে যায়।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই মহেশ দারোগার আবির্ভাব। সঙ্গে সেই চাপরাসি এবং কেনারাম ভগত। দারোগা সরকারি কাজে বাধা দেওয়ায় অভিযোগে বিজয় মাঝিকে গ্রেপ্তার করল। গ্রামের লোকজন খবরটা শুনতে পেয়ে ছুটে এসেছিল কিন্তু দারোগার চড়া মেজাজ দেখে কিছু করতেই সাহস করল না। বিজয় মাঝির স্ত্রী-পুত্র দারোগার হাতে পায়ে পড়লেন। বিজয় মাঝিকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ জানালেন, কিন্তু কোন ফল হল না। তাকে গ্রেপ্তার করে ভাগলপুরে এনে জেলে পোরা হল। শারীরিক এবং মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত বিজয় মাঝি ভাগলপুর জেলেই মারা গেল।

বিজয় মাঝির পর গর্ভু মাঝির পালা। সে আমগাছিয়ার অধিবাসীদের মোড়ল অর্থাৎ মাঝি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ বিজয় মাঝিরই অনুরূপ, সরকারি কাজে বাধা দেওয়া। তবে কেনারাম এবারে আর খালি হাতে নয়, গোরু মহিষ ক্রোক করবার কাগজপত্র নিয়ে রীতিমত প্রস্তুত হয়ে। সঙ্গে দারোগা মহেশলাল দত্ত এবং একজন পেয়াদা। দারোগা গর্ভুকে গ্রেপ্তার করে জেলে দিতে চায়। অবস্থা বেগতিক দেখে গর্ভু দারোগাকে একখানা গরু, পোয়াদাকে একটা বাছুর এবং বরকন্দাজদের কিছু টাকা দিতে বাধ্য হল। টাকাটা কেনারামই দিল বিনিময়ে গর্ভুকে একটা কাগজে সই করিয়ে নিল। গ্রামের মাঝি পারগানাদের উপর

কুশীদজীবি মহাজন এবং দারোগার সম্মিলিত অত্যাচারের কথা সেদিন সাঁওতালি গানেও ঠাঁই করে নিয়েছিল। তারই দু-একটি এখানে তুলে ধরা হল ঃ—

"পাবগানাইএঃ দাহনাউকেদে পারগানাইএঃ দাঁড়েকেদে
হায়রে হায়রে! মিছাপুর মেলা।
কেনারাম দারোগা পেয়াদা নুপারতে
হায়রে হায়রে! মিছাপুর মেলা।[২৪]
অর্থাৎ পারগানার কাছে বিনীত নিবেদন আবেদন করলাম।
হায় হায়! মিছাপুর মেলায়।
কেনারাম ভগত, মহেশ দারোগা এবং পেয়াদার জন্য
হায় হায়! মিছাপুর মেলায়।
আরো শোনা গেল ঃ
কাটজীবা দারোগা কুরুমুটাহা পেয়াদা
জিউই রেদ সুকগেদ বাং।
দারোগা ঘোড়ার উপর টাপ টাপ—
কোমর পেটে পিতর পাটা পেয়াদা ঝাক ঝাক
জিউঈ রেদ সুকগেদ বাং।[২৫]
অর্থাৎ কাটখোট্টা দারোগা ততধিক তৎপর পেয়াদা
জীবনে সুখ শান্তি কই?
দারোগা ঘোড়ার উপরে টগবগিয়ে ছোটে
পেয়াদার কোমরে পেতলের তৈরী বেলট
ঝকমক করে ওঠে
জীবনে সুখ শান্তি কই?

* * *

দে বয়হা হিজুঃকপে দেলা বয়হা নাতেনপে
হায়রে হায়রে! ভগত কেনারাম,
পারগানা বঙ্গাইএঃ দাহনাউকেদে ঘাঁখেড়াদে
হায়রে হায়রে! ভগত কেনারা...ম।[২৬]

২৪, ২৫, ধীরেন্দ্র নাথ বাস্কে, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ৫৭।
২৬. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ৫৭।

অর্থাৎ এ ভাই এস ভাই বলি শোন
হায় হায়! ভগত কেনারামের কথা।
দেবতুল্য পায়গানাব কাছে কাকুতি মিনতি করলাম।
হায় হায়! ভগত কেনারামের জন্য।

সাঁওতালি ভাষায় রচিত এ সব গান দামিনের এক প্রান্ত থেকে মুখে মুখে অন্য প্রান্তে ছাড়িয়ে পড়ল। গ্রামের মোড়ল অর্থাৎ মাঝি পারগানাদের উপরে জুলুমবাজির ফলে তাঁরা বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাদের মুখ চোখের ভাষা পাল্টে যেতে লাগল। তারা কিছু একটা করে ফেলবার জন্য ছটফট করতে লাগল। মানুষ যখন এই রকম অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন নেতার অভাব হয় না। এদেরও হয়নি। সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন বারহেটের অদূরে অবস্থিত ভগনাডিহি গ্রামের মুরমু পরিবারের দুই ভাই। সিদু এবং কানহু। তাঁদের অন্য দুই ভাই চাঁদ এবং ভৈরব ছিলেন তাঁদের সহযোগী। তাঁরা গ্রামে গ্রামে শালগিরা পাঠিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গণজমায়েতের আয়োজন করলেন।

'সাঁওতাল বিদ্রোহের অপর উল্লেখযোগ্য কারণ'

সাঁওতাল বিদ্রোহের অপর উল্লেখযোগ্য কারণ হল পাহাড়িয়াদের জন্য স্বায়ত্বশাসনেব ব্যবস্থা। যার উল্লেখ ইতিপূর্বেই দামিন-ই-কোহ-র গোড়াপত্তনের নেপথ্য কাহিনীর অংশে বিশদভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু স্বায়ত্ব শাসনব্যবস্থা কি করে একটা শান্ত নিরীহ সম্প্রদায়কে অশান্ত করে তুলল তাকে বোঝার জন্য তার যৎসামান্য উল্লেখ অপরিহার্য। পাহাড়িয়াদের কথা ভেবেই দামিন-ই-কোহ-র গোড়াপত্তন এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পাহাড়িয়ারা সেথায় যেতে অরাজি হলে প্রশাসনের আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার যোগাড় হচ্ছিল। ইতিমধ্যে সাঁওতালদের একটা অংশ সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সে কথা দামিন-ই-কোহ'র দায়িত্ব প্রাপ্ত সাদারল্যান্ড তার উপরওয়ালাকে লিখিতভাবে জানিয়ে দেয়। তখন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা সাদারল্যান্ডকে, সাঁওতালদের উৎসাহ দিতে বলে, সেইমত সাদারল্যান্ডও উৎসাহিত করতে লাগলেন, ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে সাঁওতালরা এসে, দামিন-ই-কোহ-য় জড়ো হয়। রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশে তারা বাসা

বাঁধে। ফলে সাঁওতালরা পাহাড়িয়াদের প্রতিবেশি বা আপনজনে পরিণত হলেও সাঁওতালদের সঙ্গে পাহাড়িয়াদের কোথাও কোন মিল ছিল না। সাঁওতালরা ছিল কৃষিজীবি, পরিশ্রমী অন্যদিকে পাহাড়িয়ারা ছিল কুঁড়ে, অলস। সাঁওতালরা ছিল শান্তশিষ্ট নিরীহ কিন্তু পাহাড়িয়ারা অবাধ্য, উচ্ছৃঙ্খল। এফ. বি. ব্রাডলি বার্টের লেখায় তাদের পরিচয় সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে, 'The very position and luxuriance of the Rajmahal hills encouraged them in idleness and depredation. There was little need for labour where nature supplied so much, while no better home for banditti could well have been designed than the rocky heights that overlooked the plains, yet defied the low lander by their strength and in accessibility.'*

অর্থাৎ, "পাহাড়ের (রাজমহল) চরিত্রগত অবস্থান এবং প্রাচুর্য তাকে কুঁড়ে, অলস বানিয়ে দিয়েছে এবং লুটপাটের জন্য উৎসাহ যুগিয়েছে। যেখানে প্রকৃতি স্বয়ং দু-হাতে উজাড় করে দিচ্ছে, সেখানে কোন দুঃখে সে খাটতে যাবে? পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সমতলের দুর্নিবার আকর্ষণ সে উপেক্ষা করতে পারে না, অন্যদিকে তার উচ্চতা এবং দুর্গম্যতা তাকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে সমতলবাসীর নাগালের বাইরে রেখে দিয়েছে।"

পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে সমতলভূমিতে নেমে সে নির্বিচারে লুটপাট করে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেত অথচ তাদের জন্য ছিল আলাদা প্রশাসনিক ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে আমরা জেনে গেছি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতালরা দলে দলে এসে দামিন-ই-কোহ'য় জমায়েত হয়েছে। কিন্তু এই ঘটনা তাদের চোখ খুলে দিল, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল মারের বদলে মার দিতে। এই ঘটনাই তাকে আপোসহীন সংগ্রামী হবার উৎসাহ যুগিয়েছিল। তবে সাঁওতাল বিদ্রোহকে পাহাড়িয়াদের অন্ধ অনুকরণে অভিহিত করা অনুচিত। কারণ তারা হঠাৎ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেনি। প্রথমে ভগনাডিহির মাঠে সমবেত হয়েছে, সেখান থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে, সেই সিদ্ধান্ত প্রশাসনকে জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যখন দেখল প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই তখন কালবিলম্ব না করে কলকাতা অভিমুখে রওনা দিয়েছে। পদযাত্রায় বাধা পেয়েই তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে,

ব্রাডলি বার্ট হিস্ট্রি এন্ড এথনোলজি অফ অ্যান ইন্ডিয়ান আপল্যান্ড, পৃষ্ঠা-৮।

বাঁধনহারা হয়ে উঠেছে। তবে লুটপাট করে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে কিনা, তাই নিয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, সেটা প্রমাণসাপেক্ষ। Sonthalia and Santhal এর লেখক ই. জি. মানের অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে বলতেই হয় এ কাজ পাহাড়িয়াদের, সাঁওতালদের নয়। কারণ :

"In the, 'Skirt of the hills' dwell the Santals. Here, again, nature seems to have stepped into provide for a people in need a home and the means of subsistance best suited to the manner of men they were."

অর্থাৎ, 'পাহাড়ের পাদদেশে সাঁওতালদের বাস। প্রকৃতি, এখানেই, এমন একদল লোককে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে তৈরি হয়ে আছে, যাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই, বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন এবং জায়গাটা যাদের মেজাজের উপযুক্ত।" লুটপাট তাদের চরিত্রবিরোধী। তারা—

"It seemed as if nature had reserved this land from all time for the Santals in their hour of need, and no race could have been more fit and worthy so great an inheritance."*

অর্থাৎ, "সাঁওতালদের প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে লাগবে বলেই প্রকৃতি যেন জায়গাটাকে আগলে রেখেছিল, সাঁওতাল ছাড়া আর কেউ তার উপযুক্ত নয় তার যোগ্যও নয়।"

* এফ. বি. ব্রাডলি বার্ট—হিস্ট্রি এন্ড এথনোলজি অফ অ্যান ইন্ডিয়ান আপল্যান্ড, পৃষ্ঠা. ৯, ১০।

"কলকাতা অভিমুখে পদযাত্রা কিন্তু দারোগার কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণের ফলে যাত্রাপথ পরিবর্তিত"

নির্ধারিত তারিখে প্রায় ১০,০০০ হাজার সাঁওতাল দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে বারহেটের অদূরে ভগনার্ডিহির মাঠে সমবেত হয়ে ইতিহাস রচনা করলেন। ইতিপূর্বে তারা তাঁদের অভাব অভিযোগ জানিয়ে বিভিন্ন সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন এবং পনেরো দিন সময় দিয়েছিলেন জবাব দেওয়ার জন্য। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো রকমের সাড়া না পেয়ে তারা হতাশ হয়ে পড়লেন, তারা বুঝতে পারলেন যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সুবিচার পাবার আশা কম। এমতাবস্থায় তারা ঠিক করলেন কলকাতায় গিয়ে বড়লাটের কাছে তারা তাদের অভিযোগ জানিয়ে আসবে। সেইমত ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুন এক বিরাট জনতা দামিন-ই-কোহ থেকে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গলের লেখক, ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টারের মতে এই অভিযাত্রায় নেতাদের দেহরক্ষীর সংখ্যাই ছিল ৩০,০০০ হাজাব।

"A general order went through the emcampment to move down upon the plains towards Calcutta and on 30th June 1855 the vast expedition set out. The bodyguard of the leaders alone amounted to 30,000 men."[২৭]

অর্থাৎ সমতলের উপর দিয়ে কলকাতার অভিমুখে যাত্রা করবার একটা সর্বসম্মত নির্দেশ জনতার মধ্য থেকেই উত্থিত হল এবং সেইমত ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩০ জুন এক বিরাট জনতার অভিযান শুরু হল। অভিযানে নেতাদের দেহরক্ষীর সংখ্যাই ছিল ৩০,০০০ হাজার।

তবে অভিযানে কেবল সাঁওতালরাই ছিলেন না, ছিলেন অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত, মেহনতী মানুষ। সেই অভিযানের কথা লিখতে গিয়ে ক্যালকাটা রিভিউ লিখছে :

"Certain castes like Kumhars (Potters) telies (oilmen) black Smith, momins (muhamodan weavers) charmars (Shoe makers) and domes. Who were obedient to Santals and had helped them

২৭. ডবলিউ. ডবলিউ. হান্টার, দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল, পৃ. ১৬৪।

in several ways, were exempted from their vengeance. Commissioner wrote, from all account it appears that the Santal were led and incited to acts of opression by the Gwallah (Milkmen), telies (Oilmen) and other castes who supply them with intelligence, beat their drums, direct their proceedings and act as spies. These peoples as lohars (Black Smith) who make their arrows and ought to meet with condign punishment and be speedily included in any proclamation which Government may see fit to issue against the rebels."[২৮]

অর্থাৎ হিন্দুদের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি নিম্নবর্ণীয় সম্প্রদায় যেমন কুমার (হাঁড়ি প্রস্তুতকারক), তেলি (তৈল প্রস্তুতকারক), কামার, চামার (জুতা প্রস্তুত-কারক), মোমিন (কাপড় প্রস্তুতকারক মুষলমান সম্প্রদায়) এবং ডোম প্রভৃতি যারা সাঁওতালদের অনুগত এবং যারা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নানাভাবে সাহায্য করে থাকে তাদের তারা আক্রমণের বাইরে রেখেছিলেন।

ভাগলপুরের কমিশনারের লেখা চিঠিতেও এই কথারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন, সব দিক খতিয়ে দেখে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গোয়ালা (দুধ সরবরাহকারী), তেলি (তৈল প্রস্তুতকারক) এবং অন্য নিম্নবর্ণীয় সম্প্রদায় সাঁওতালদের অভিযানে নেতৃত্ব এবং নিপীড়নের জন্য উৎসাহ দিচ্ছে। এরা সাঁওতালদের বুদ্ধি যোগাচ্ছে, অভিযানের নির্দেশ দিচ্ছে এবং নাগড়ার আওয়াজ দিয়ে তাদের অনুচরের কাজ করছে। এইসব লোককে এবং কামারকে যারা তাদের তীর এবং কুঠার তৈরি করে তাদের কাজের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থার জন্য সুপারিশ করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কাছে যেটা উপযুক্ত মনে হয় সেই রকম শাস্তির ঘোষণা অবিলম্বে করা হউক।

এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, হুলকে কোনো অবস্থাতেই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যায় না। সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষ, যারা ছিল প্রকৃত অর্থেই খেটে খাওয়া মেহনতী সম্প্রদায়ের, যাদের অবস্থা সাঁওতালদের তুলনায় কোনো অংশেই ভালো ছিল না, তারা সিদু-কানহু এবং তাঁর দলবলকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন এবং শাসক এবং শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছিলেন।

অভিযাত্রীর দল কলকাতা অভিমুখে যাত্রা শুরু করবার পূর্বে নিকটবর্তী বাজার পাঁচ ক্ষেতিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পাঁচক্ষেতিয়ায় অবস্থিত

২৮. ফ্রম দি কমিশনার অব ভাগলপুর টু দি সেক্রেটারি টু দি গর্ভনমেন্ট অব বেঙ্গল ২৮ জুলাই ১৮৫৫, কে. কে দত্ত, দি সান্থালইন সা. ১৬

দেবতার শ্রীচরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করে, তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করা। প্রতিহিংসার কোনো ইচ্ছাই তাঁদের ছিল না। ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার লিখছেন :—

"From this day-the 7th July-the rebellion dates, At the time of their setting out they do not seem to have contemplated armed opposition to the Government when all was over, their leaders, who in other respects at any rate disdained equivocation of falsehood, solemnly declared that their purpose was to march down to calcutta, in order to lay the petition whcih the local authorities had rejected at the feet of Governor General."[২৯]

অর্থাৎ "উল্লেখিত দিন থেকে—জুলাই এর ৭ তারিখ বিদ্রোহ ঘোষণার দিন। অভিযান শুরু করবার সময় পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে বিরোধীতার কোনোরকম আশঙ্কা তারা করেনি। সব কিছুই যখন ঠিকঠাক তাদের নেতা যাঁরা কথায় এবং কাজে কোনোরকমের রকমফেরের বিরোধী ছিলেন। মিথ্যার যে কোনো রকমের দ্ব্যর্থকতায় যাঁরা ঘৃণা করতেন তাঁরা সর্গবে ঘোষণা করেছিলেন তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কলকাতার অভিমুখে যাত্রা করা এবং যে দাবীপত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষ খারিজ করে দিয়েছে—গভর্নর জেনারেলের পদতলে তা পেশ করা।"

ইতিমধ্যে মহাজনরা সাঁওতালদের সমবেত হবার খবর শুনে এবং পাঁচক্ষেতিয়া অভিমুখে রওনা হবার কথা শুনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাঁরা দীঘি থানার কুখ্যাত দারোগা মহেশলাল দত্তের কাছে সাঁওতালদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় এবং চুরির মিথ্যা অভিযোগে সিদু-কানহুকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ঘুষ প্রদান করে। মহেশ দারোগা তাঁর দলবল নিয়ে সিধু-কানহুকে দমন করবার উদ্দেশ্য রওনা হয়। পথিমধ্যে সিধুর একজন অনুচর দারোগাকে সিধু-কানহুর আড্ডায় নিয়ে যায়। সিধু-কানহু দারোগাকে জিজ্ঞেস করে তিনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? দারোগা প্রথমে মিথ্যা কথা বলে। তিনি বলেন, তিনি সাপে কাটা মৃত্যুর তদন্ত করতে এসেছেন। এই কথায় দারোগাকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু কোনো একজনের মনে হল দারোগা মিথ্যা কথা বলছেন। তাই তাঁকে জেরা করতে শুরু করলেন। জেরার মুখে দরোগা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, মহাজনরা তাঁকে টাকা দিয়েছে চুরির মিথ্যা অভিযোগে সিধু-কানহুকে গ্রেপ্তার করবার জন্য।

জনতা এতক্ষণ শান্তই ছিল, সংযতই ছিল। যদিও ইতিপূর্বে মহাজনদের সঙ্গে চক্রান্ত করে দারোগা লিটিপাড়ার বিজয় মাঝিকে জেলে দিয়েছে, আমগাছিয়ার

২৯. ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার, দি অ্যানালস অব রুর‍্যাল বেঙ্গল পৃ-১৬৫

গর্ভু মাঝিকে হেনস্থা করেছে, গোচো মাঝিকে হেনস্থা করেছে। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ না করে তাঁরা ধৈর্য্য সহকারে সব সহ্য করেছেন। কিন্তু যখন তাঁরা দারোগার মুখ থেকেই শুনলেন, মহাজনরা তাকে টাকা দিয়েছে চুরির মিথ্যা অভিযোগে সিধু-কানহুকে গ্রেপ্তার করার জন্য, তখন তাঁদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। দারোগার এই একটি কথাতেই বিদ্রোহের চরিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। অহিংস জনগণ সহিংস হয়ে উঠলেন। তাঁরা শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে দারোগাকে বললেন যদি প্রমাণ থাকে গ্রেপ্তার করুন। মাথা মোটা দারোগা শান্ত স্বভাব সাঁওতালদের মনের অবস্থা তখনও বুঝতে পারেননি। তিনি তাঁর দলবলকে সিধু-কানহুকে গ্রেপ্তার করতে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সিধু এক ঝটকায় অন্যের হাত থেকে টাঙ্গি কেড়ে নিয়ে, টাঙ্গির এক কোপে দারোগার মাথা ধড় থেকে আলাদা করে দিলেন এবং অন্যরা তার দলবলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সমবেত জনতা হুল, হুল বলে চিৎকার করে উঠলেন, মুহূর্তের মধ্যেই হুলস্থুল পড়ে গেল।

ফাঁসীর আগে কানহু যে জবাববন্দী দিয়েছিলেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য :

"...The mahajans complained to Buroo Daragah that Seedoo & Kanhoo were collecting men to commit a dacoitee, the mahajans gave him 100 Rs. to come & catch us. The Daragah was sitting at Baboopara he sent a burkundauge to me before. He counted the men I then gave a purwannah to the burkundauge saying the Thakoor has desended & we are assembled for the purpose of making a complaint why do you interfare, the darogah remained 2 days & then went... . Then I sent for him & he came with the mahajans into a maindan. He asked me, "Where are you going." I said, "I have come about a purwannah I sent you." He said that he had seen the purwannah but that he did not come to through fear & the mahajans showed a purwannah for bidding him to come to me also & told him to bring soldiers with him or else, the Sonthals would take his head off, then I said I did not send that purwannah the mahajans have altered my purwannah & sent you that. I said, "Why have you come?" He said, "I have come to investigate a snake bite death." Then he said that, you are collecting men for dacoitee. I said prove it, if I have committed a theft or dacoitee. If you prove anything, put me in jail. The mahajans said if it costs us Rs. 1000 we will do that to get you imprisoned.

The mahajans & the Darogah got very angry & ordered them to tie me up. The mahajans began to tie Seedoo my brother, then I drew my sword then they left off tying my brother & I cut Manick Mudie's head off and Seedoo killed the Darogah and my army killed 5 men whose names I do not know, then we all returned to Bhagnadee."[৩০]

অর্থাৎ মহাজনরা বড় দারোগার কাছে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে যে সিদু-কানহু ডাকাতির জন্য লোক জড়ো করেছেন। তাঁরা দারোগাকে ১০০ টাকা দিয়ে সিদু-কানহুকে গ্রেপ্তার করতে বলে। দারোগা বাবুপাড়ায় ছিলেন এবং তাঁর এক বরকন্দাজকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। তিনি এসেই মাথা গুনতে শুরু করেন, আমি তাকে একখানা পরোয়ানা দিয়ে বললাম, ঠাকুর আবির্ভূত হয়েছেন, তুমি কেন আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছ? দারোগা সেখানে দু' দিন থেকে চলে গেলেন। আমি তখন তার উদ্দেশ্যে পরোয়ানা পাঠিয়েছিলাম, তিনি ম্যানডেনে করে মহাজনদের সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি উত্তর দিলাম, আমি আপনাকে পরোয়ানা পাঠিয়েছি, সেটাই জানতে এসেছি। দারোগা উত্তর দিলেন, পরোয়ানা আমি পেয়েছি কিন্তু ভয়ে আসি নাই। মহাজনরা অন্য একটা পরোয়ানা দেখিয়ে আমাকে আসতে নিষেধ করেছে, কারণ, সাঁওতালরা আপনাকে হত্যা করবে। কানহু বললেন যে, পরোয়ানা আমি পাঠাইনি, মহাজনরা পরোয়ানা পাল্টে আপনাকে দিয়েছে। আমি দারোগাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন এসেছেন? দারোগা উত্তর দিলেন, আমি সাপে কাটা মৃত্যুর তদন্ত করতে এসেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ডাকাতি করবার জন্য লোক জড়ো করছ? আমি উত্তর দিলাম, প্রমাণ করুন, যদি চুরি অথবা ডাকাতি করে থাকি, জেলে দিন। এতক্ষণে মহাজনরা বললেন, যদি ১০০০ টাকা খরচা হয়, আমরা তোমাদের জেলে পাঠাব। দারোগা এবং মহাজনরা ভীষণ রেগে গেলেন এবং আমাদের বাঁধতে আদেশ দিলেন। মহাজনরা আমার ভাই সিদুকে বাঁধতে লাগল। তখন আমি খাপ থেকে তরবারি খুললাম তাই দেখে মহাজনরা পিছিয়ে গেলেন এবং আমি মানিক মুদির মাথা কেটে ফেললাম এবং সিদু দারোগাকে হত্যা করল। আমার লোকজন অন্য পাঁচজনকে হত্যা করল, যাদের নাম আমি জানি না। তার পরে আমরা ভগনাডিহিতে ফিরে এলাম।

এখানে যেটা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এবং যার জন্য সাঁওতাল হিসেবে আমি গর্ববোধ করি সেটা হল কানহুর অকপট স্বীকারোক্তি। তাঁরা ছিলেন সাচ্চা

৩০. তারাপদ রায় সম্পাদিত সান্থাল রিবেলিয়ন পৃ. ৬৮

বিপ্লবী, নির্ভেজাল দেশপ্রেমিক, তাই ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়েও সত্যি বলতে বুক কাঁপেনি। সিধু-কানহু তোমায় আমরা ভুলিনি, ভুলব না।

এই প্রসঙ্গে "দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গলের" লেখক ডাইলিউ. ডাবলিউ হান্টারের মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"The foolhardy inspector, presuming on the usually peaceable nature of the Santal, orders his guards to pinion them, but no sooner were the words out of his mouth, than the whole mass rushed upon him, and bound him, and his minions. After a hurried trials, the chief leader Sidu slew the corrupt inspector with his own hands, and the police left nine of their party dead in the Santal Camp."[৩১]

অর্থাৎ, মাথা মোটা দারোগা সাঁওতাদের শান্ত স্বভাবের কথা স্মরণ করে তাঁর দলবলকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। তাঁর মুখ থেকে গ্রেপ্তার কথাটি বার হবার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা তার দলবলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দারোগা এবং তাঁর দলবলকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। তৎক্ষণাৎ বিচার হল তাঁদের। দলের নেতা সিধু দারোগাকে নিজ হাতে খুন করলেন এবং সমবেত জনতার হাতে ন'জন পুলিশ কর্মী খুন হলেন।

এই ঘটনার পরে বিদ্রোহীরা রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠলেন। দারোগা এবং তাঁর দলবলের মৃতদেহ সেখানে পড়ে রইল, অভিযাত্রীর গতিপথ পরিবর্তিত হল। কলকাতার অভিমুখে যাত্রার পরিবর্তে তাঁরা পাঁচ ক্ষেতিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। তৎকালে সেখানে কয়েকজন ধনী মহাজনের বাস ছিল। তাঁরা হলেন মানিক চৌধুরি, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিত, নিমাই দত্ত এবং হারু দত্ত। সিধু-কানহুর দল তাঁদের সকলকে একে, একে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে নির্যাতনের জ্বালা জুড়ালেন। ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টারের মন্তব্য এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

"And the precipitate outradge upon the Inspector of Police changed the whole character of the expedition. The inoffensive but half tamed high lander had tasted blood and in a moment his old savage nature returned."[৩২]

অর্থাৎ, "এবং পুলিশ ইনসপেকটরের হিতাহিত চিন্তা শূন্য আচার-আচরণ এবং ফলস্বরূপ তাঁর হত্যা, অভিযানের চরিত্রকেই পাল্টে দিল। নিরীহ আধা

৩১. ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার, দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল পৃ. ১৬৫, ১৬৬

৩২. ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার, দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল পৃ. ১৬৫, ১৬৬

অসভ্য বর্বর অরণ্যচারীরা রক্তের স্বাদ পেতে মুহূর্তেই তাদের অন্তরে আদিম প্রবৃত্তি জেগে উঠল।”

গোড্ডা মহকুমার অধীনস্থ কুরহুরিয়া থানার নায়েব সুজাওয়াল প্রতাপ নারায়ণ বিদ্রোহ শুরু হবার আগে ছুটি কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহ শুরু হতেই ছুটি বাতিল করে কাজে যোগ দিতে যাবার আগে সালখুন (Sulkhun) পরগানাইতে বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাকে দেখতে না পেয়ে থানায় ফিরে যাচ্ছিলেন। পথে একদল সাঁওতাল বিদ্রোহীর সঙ্গে দেখা। বিদ্রোহীরা তাঁকে, ঠাকুর তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন নাম করে সোনারচকে (গোড্ডা মহকুমার কেরওয়ারের কাছে চুনাচকে) নিয়ে আসে এবং হত্যা করে।

বিদ্রোহীরা অতঃপর বারহেট বাজারে এসে উপস্থিত হয়। বারহেট সেই সময় একখানা বর্ধিষ্ণু শহর ছিল। সেখানে বহু বাঙালী এবং অবাঙালী ধনী মহাজন ও ব্যবসায়ীর বাস ছিল। বিদ্রোহীদের আগমনের সংবাদ পেয়েই আতঙ্কিত লোকজন ছোটাছুটি শুরু করে, প্রাণ হাতে নিয়ে সব কিছু পিছনে ফেলে যে যেদিকে পারলেন ছুট দিলেন। বিদ্রোহীরা বারহেটে পৌঁছে নির্বিবাদে লুঠ করতে লাগলেন। খান সাহেব নামে একজন নায়েব সুজাওয়াল বাবুপুর থেকে পাঁচক্ষেতিয়া যাবার পথে কানহুর হাতে খুন হলেন।

“বিদ্রোহের খবরে বিনা মেঘে বজ্রপাত”

কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্রোহ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামের পর গ্রামে গিয়ে হাঙ্গামা শুরু করে দিলেন। অগ্নি সংযোগ, লুঠতরাজ, খুন, জখমের ঘটনা অবাধে চলতে লাগল। আতঙ্কিত লোকজন সবকিছু পিছনে ফেলে পালাতে লাগলেন। বিদ্রোহীরা বিনা বাধায় সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে ঘর জ্বালিয়ে দিতে লাগলেন।

বারহেট লুণ্ঠিত হবার পরেই সিধু-কানহুর নেতৃত্ব স্বীকার করে নেওয়া হল। তাঁদের দুজনকে তারা অর্থাৎ বিদ্রোহীরা শুভোবাবু বা সুবেদার বলে ঘোষণা করলেন। তাদের কপালে শুয়োরের চর্বি এবং পবিত্র সিন্দুর দিয়ে মাঙ্গলিক চিহ্ন এঁকে দেওয়া হল। দুজন জোয়ান ছেলের কাঁধে চড়ে তাঁরা রওনা হতেন। লুণ্ঠনের পূর্বে প্রত্যেক গ্রামে পবিত্র শালের ডাল পাঠিয়ে গ্রামবাসীকে সতর্ক করে দেওয়া হত এবং বিনা বাধায় গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ পাঠানো হত। আতঙ্কিত লোকজন গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেলে বিদ্রোহীরা গ্রামে ঢুকে বিনা বাধায় নির্বিচারে লুটপাট চালাতেন এবং বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিতেন। এবং

এই ভাবে একটার পর একটা গ্রাম লুট করে, বাড়িঘর জ্বালিয়ে তাদের উপর নির্যাতনের আক্রোশ মেটাতে লাগলেন। কয়েকদিনের মধ্যে বিদ্রোহ ব্যাপক আকার নিল। আইন শৃঙ্খলার অবনতি দেখা দেওয়ায় লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিল। বিদ্রোহের খবর ভাগলপুরে পৌঁছাল ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৪ জুলাই। মিঃ এইচ. ই. রিচার্ডসন তখন ভাগলপুরের কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। বিদ্রোহের খবর তিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিলেন। তিনি কোনো গুরুত্বই দিলেন না। কিন্তু পরের দিন যখন পুনরায় খবরটা শুনলেন, তাঁর মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, তাঁর মনে হল মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়েছে। ক্যালকাটা রিভিউর সমসাময়িক কালের একজন লেখক লিখছেন :

"The news of insurrection come like thunder clap upon those who heard of it, that in the centre of Bengal there was a rebellion and that a race of people, almost unheard, certainly unthought of were in arms, murdering and running riots through out the land."[৩৩]

অর্থাৎ, বিদ্রোহের খবরটা যারাই শুনলেন তাদের সবার কাছেই মনে হল যেন, বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়েছে। বাংলা প্রেসিডেন্সির মধ্যস্থলে এমন এক জনগোষ্ঠী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে যাদের সম্বন্ধে জনগণ খুব কমই অবহিত আছে, তারা যে এ কাজ করতে পারে সেটা চিন্তার বাইরে, তারাই অস্ত্রধারণ করেছে, লুঠপাঠ সংঘটিত করেছে গোটা প্রদেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধিয়েছে।

তিনি আরো লিখেলেন :

"Such an strange occurance had not clouded the prosperity of the lower province of Bengal with in the Anglo-Indian memory of man."[৩৪]

অর্থাৎ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের স্মরণ কালের মধ্যে এমন অভূতপূর্ব ঘটনা নিম্নবঙ্গের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে নাই।

স্পষ্টই বোঝা যায় সরকার এমন একটা ঘটনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ক্যালকাটা রিভিউর সমসাময়িক কালের একজন লেখক সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন :

"When the blow was at last struck, 1200 troops could not be found within 80 miles of rebels. For a whole fortnight the

৩৩. কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনকারেকশন পৃ. ১৮
৩৪. কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনকারেকশন পৃ. ১৮

Santal Spread fire and sword throughout the Western districts. The armed masses ceased to be controlled by the leaders who had set them on and before the end of July 1855. Scores of villages had been burned, thousand of cattle were driven away, English troops were beaten back and several Englishmen along with two Engligh ladies were slain. Many a English station and factory lay at the mercy of the marauders."[৩৫]

অর্থাৎ, বিদ্রোহীরা প্রথম যখন আঘাত হানে তখন তার ৮০ মাইলের মধ্যে ১২০০ শ' সৈনিকও ছিল না। জেলার সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল জুড়ে এক পক্ষকাল ধরে সাঁওতালরা তরোয়াল দিয়ে আঘাত এবং অগ্নিসংযোগ সংঘঠিত করে। তাদের নেতা যারা অভিযানের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিল অস্ত্র হাতে জনতাকে বাগে আনতে সমর্থ হয়নি। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই-এর শেষ নাগাদ বিদ্রোহী জনতা বেশ কয়েকটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, হাজার হাজার গরু ছাগলকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়, ইংরেজ বাহিনী পরাজিত ও পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়, এবং দুজন ইংরেজ মহিলা সহ কয়েকজন ইংরেজকে হত্যা করে। বিদ্রোহী জনতার লুণ্ঠনের হাত থেকে ইংরেজী প্রতিষ্ঠান ও কারখানাও রেহাই পায়নি।

অবস্থা সরজমিনে খতিয়ে দেখতে ভাগলপুরের তৎকালীন কার্যনিবাহী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এইচ, ই, রিচার্ডসন ভাগলপুর থেকে রওনা দিলেন। দামিন-ই-কোহ-র সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ পন্টেটকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ৬ জুলাই বিকেলে রাজমহলে এসে উপস্থিত হন। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা স্টিমার "মেঘনার" ক্যাপটেনের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং পাইক বরকন্দাজ নিয়ে নিজেদের সুরক্ষিত করার বন্দোবস্ত করলেন।

ভাগলপুরের নব নিযুক্ত কমিশনার সি, এফ, ব্রাউন বিদ্রোহের খবর পেয়েই বিদ্রোহ দমনের জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। তিনি তৎপরতার সঙ্গেই মেজর এফ. ডবলিউ. বারোজকে বিদ্রোহ দমনের জন্য নিয়োগ করলেন। তিনি প্রথমেই বারোজকে একদল সৈন্য নিয়ে রাজমহলের উদ্দেশ্যে রওনা হবার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে, বিদ্রোহীরা বোরিও এবং কহলগাঁও এর মধ্যবর্তী সমস্ত গ্রাম লুঠ করে একদল রাজমহলের দিকে, রাজমহলের ২০ মাইলের মধ্যে চলে এসেছে এবং অন্য দল ভাগলপুরের দিকে ভাগলপুর জেলে বন্দী কয়েদীদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে, তখন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে একদল সেনাকে ভাগলপুরের জন্য নিয়োগ করে অন্য দল নিয়ে বারোজকে রাজমহলের উদ্দেশ্যে রওনা হতে বললেন। মেজর বারোজ তাই করলেন। একদল

৩৫. ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার, দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল পৃ. ১৬৫, ১৬৭

সেনাকে ভাগলপুর গার্ড দেওয়ার জন্য রেখে বাকিদের নিয়ে রাজহলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। কিন্তু কমিশনার ব্রাউনের এই সংখ্যাটা যথেষ্ট মনে না হওয়ায় পাহাড়িয়া সর্দার, জমিদার এবং তাঁর অধীনস্থ জমিদার, পরগণা এবং থানার দারোগাদের কাছ থেকেও সাহায্য নিয়ে জেলখানার নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিলেন।

কমিশনারের নির্দেশ পেয়ে মেজর এফ. ডাবলিউ. বারোজ ১৬০ জন সৈন্য নিয়ে রাজমলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ১০ জুলাই ১৮৫৫ বিকেল নাগাদ রাজমহলে পৌঁছলেন, কিন্তু নৌকোর অভাবে নদী অতিক্রম করতে পারলেন না। ১১ জুলাই সকালে কহলগাঁও থেকে ভাগলপুরের কমিশনারকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন : 'We hear that the insurgents move about in very small partys but their drums sounding the assemble in partys 10,000 each for the purpose of plundering and as my detachment to small to be divided without greatly impairing its efficiency. I think it best to keep in one party ready to oppose any party I may hear of in this neighbourhood or to intercept their proceeding to Bhagalpur, or move to that station for its defend before they can reach it, should the latter measure necessary. As a further rise of the river to the extent of three or four feet (and now it is rising) would place the road between this place and Bhagalpur under water, I think it right to draw your attention to this point when fevouring me with your further instruction. If the river continues to rise for another week or ten days, It will, I fear, be impassable for troops"[৩৬]

অর্থাৎ, "এখানে পৌঁছে খবর পেলাম যে, বিদ্রোহীরা এখন ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আছে। কিন্তু যখনই তাদের নাগড়া বেজে উঠছে তারা দলে ভারী হয়ে লুটপাটের উদ্দেশ্যে ১০,০০০ হাজারে পৌঁছে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় যেহেতু আমার সেনাবাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক সেনা নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যায় সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করে, সেনাবাহিনীর শক্তি ক্ষয় করে বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হলে পরাজয় অবধারিত; তাই আমি মনে করি সেনাবাহিনীকে একত্র করে এক জায়গায় রাখা। যখন পার্শ্ববর্তী কোথাও লুটপাটের খবর শুনব অথবা বিদ্রোহীরা ভাগলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে শুনলে বাধা দেব। তাদের পৌঁছাবার আগেই তার প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে পৌঁছনোর চেয়ে আমার পরের পরিকল্পনাটাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। নদীর জল বাড়ছে। এই বৃদ্ধি যদি তিন অথবা চার ফুটে পৌঁছে

৩৬. কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনসারেকশন ১৮৫৫-৫৭, পৃ. ২১

যায় তবে এখান থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত পুরো এলাকাটাই জলের তলায় চলে যাবে (এবং এখন এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে)। এই অবস্থায় আমার কি করণীয় জানিয়ে আমাকে বাধিত করবেন। আমার ভয় হচ্ছে, নদীর জল যদি এই ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে পরবর্তী সাত অথবা দশদিনের মধ্যে সেনাবাহিনীর নদী অতিক্রম করা হবে না।

তার সঙ্গে তিনি আরো যোগ করলেন :

"As the insurgents are said to more in scattered parties, it seems to me that it would not be prudent for my detachment to move from this place in search of them"[৩৭]

অর্থাৎ, "যেহেতু বিদ্রোহীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অতএব এই জায়গা ছেড়ে তাদের অনুসন্ধান করা আমার দলের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।"

বারোজের চিঠি পেয়েই কমিশনার ব্রাউন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, বারোজের একার পক্ষে বিদ্রোহ দমন করা অসম্ভব। তাই কাল বিলম্ব না করে দানাপুর সেনা ছাউনির মেজর জেনারেল লয়েডকে লিখলেন ভাগলপুরের নিরাপত্তা এবং বিদ্রোহ দমনে বারোজকে সাহায্য করার জন্য অবিলম্বে সেনাবাহিনীর প্রয়োজন। লয়েড ব্রাউনের আবেদনে সাড়া দেবেন এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু দানাপুর থেকে ভাগলপুর এবং সেখান থেকে রাজমহলের উদ্দেশ্যে রওনা হতে সময় লাগবে। ইতিমধ্যে বিদ্রোহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে, বিদ্রোহ আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে পারে তাই কমিশনার ব্রাউন পার্শ্ববর্তী বীরভূম, বাঁকুড়া, ছোটনাগপুর, সিংভূম, হাজারীবাগ, পূর্ণিয়া এবং মুঙ্গেরের ম্যাজিস্ট্রেটদের বারোজকে সাহায্য করতে বললেন, বিশেষ ভাবে পূর্ণিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন বিদ্রোহ দমনের জন্য সব রকমের সাহায্য করতে এবং কালেক্টরকে বললেন যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব হাতী যোগাড় করে হাতির মালিক এবং মাহুতের নাম নথিভুক্ত করতে। কারণ সরকার সেগুলিকে ভাড়া হিসেবেই নিতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে বারোজকে বললেন পিয়ালপুরে গিয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দিতে। ভাগলপুরের কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিচার্ডসন তখন ভাগলপুরের বাইরে ছিলেন। তাই তাঁকে অবিলম্বে কহলগাঁও-এ যেতে বললেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর সহকারী মিঃ সি, ই, চ্যাপম্যানকে তাঁর হয়ে সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে সাহায্য করতে বললেন।

৩৭. কে. কে. দত্ত, দি সাঁওতাল ইনসারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭, পৃ. ২২

"বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ভাগলপুরের কমিশনারের ল্যাজে গোবরে অবস্থা।"

ইতিমধ্যে বিদ্রোহ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীরা গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করে জ্বালিয়ে দিয়ে থাকে। আতঙ্কিত লোকজন যে যেদিকে পারছে পালিয়ে যাচ্ছে। দু একজন যারা পালাবার সুযোগ পাচ্ছে না তাদের হত্যা করা হচ্ছে। মেজর বারোজকে বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে পাঠালেও বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রথম সংঘাত বাধে রেলপথ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত রেল কর্মচারীদের। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, East India Company তখন রেল পথের সুবিধা দিতে ২০০ মাইল লম্বা রেল পথ নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিল। ভারতবর্ষ কোম্পানীর উপনিবেশ ছিল। এখান থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে বিদেশে রপ্তানি করা হত এবং বিদেশ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য ভারতবর্ষের বাজারে আমদানি করা হত। এতদিন পর্যন্ত গরুর গাড়িতে করে অথবা নৌকোয় মাল পরিবহনের ব্যবস্থা ছিল ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। কিন্তু রেলপথ নির্মিত হলে এই অসুবিধাগুলি দূরীভূত হবে। ফলে কোম্পানীর লভ্যাংশ বৃদ্ধি পাবে। এ সব কথা ভেবেই কোম্পানী রেলপথ নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিল অর্থাৎ মূলতঃ বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে সখারাম গণেশ দেউস্করের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক :—

"সেকালে রাক্ষসরাজ রাবণ পুষ্পকরথের সাহায্যে অবলীলাক্রমে লক্ষ্মীস্বরূপিনী সীতাদেবীকে হরণ করিয়া সমুদ্রপারে স্বীয় রাজধানী লঙ্কায় লইয়া গিয়াছিল, ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য হরণ করিয়া লঙ্কার সৌন্দর্য বর্ধন করিয়াছিল। এ কালে ইংরাজ বাষ্পীয় শকটরূপী পুষ্পক রথের সাহায্যে ভারতের যাবতীয় শস্য স্বদেশে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, দেশীয় শিল্পের বিনাশসাধনপূর্বক বৈদেশিক পণ্য দ্রব্যে ভারতবর্ষ পূর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন।*

রেলপথ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আমদানি-রপ্তানী কি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল নিম্নপ্রদত্ত সারণি থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায় :—

রেলপথ (মাইলের হিসাবে)

সাল	
১৮৭৩	৫৬৭৯ ছিল

*দেশের কথা, সখারাম গণেশ দেউসকর, পৃ.-৮৬/৮৭

১৮৮০	৯১৬৭ হইল
১৮৮৫	১২৩৫৫ ,,
১৮৯০	১৬৯৮৪ ,,
১৮৯৫	১৯৭১৮ ,,
১৮৯৯	২৩৭৮০ ,,
১৯০০ (২১ মার্চ পর্যন্ত)	২৬৪৭৪ ,,

সাল	আমদানি	রপ্তানি
১৮৫৫	১৭৯০১৬৯৮০	১৭২৩১৬৪৮০
১৮৬০	২৭৩৭৫৩১২০	২৮৭৮১৫২৪০
১৮৬৫	৩২৮৭৬৪৯০০	৩৮৪৪২৯৫০০
১৮৭০	২৭৫৩৪০৬৭০	৩৮৫৬১৯৯৭০
১৮৭৫	৩২১৪৭৯০৪০	৪২০৮৯৭৫১০
১৮৮০	৪১২০৯১৬২০	৫৩৬০৬৭১১০
১৮৮৫	৫০০৮৯৫৩৪০	৬০১৮৫০৯৯০
১৮৯০	৫৯১৩০৬২২০	৭২৪৪৮৭৩২০
১৮৯৫	৮৮৫৫৮৩৩৩৫	১১৩৯২৯৮৬৩০
১৯০২	১১১১৮৪৪০০৭	১৫৯০৬৫৫৭০৭

"Whatever lack of money there may for education, or for sanitary improvements, or for irrigation, or for other things which the people of India so earnestly desire and pray for, the Government always seems to have plenty for railways why? Because the railways of India help the English people to wealth...the railways have broken up many of the old industries of India and thus have brought hardships and suffering to millions of people; but they enrich the ruling nation, and they give her a firmer military grip upon her valuable dependency and so money can always be found for them, whateverelse suffers."*

ইতিমধ্যে হাওড়া থেকে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত রেলপথ নির্মিত হয়েছিল, তাকে রাজমহল পর্যন্ত প্রসারিত করবার জন্য মেসার্স নেলসন এন্ড কোম্পানীকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল। সাঁওতালদের গ্রামের পাশ দিয়েই রেললাইন পাতার কাজ চলছে।

*গ্রন্থ ঐ, পৃ.-৮৭

রেলপথ নির্মাণের কাজে নিযুক্ত সাহেবরা সাঁওতাল গ্রামে ঢুকে জোর করে পয়সা না দিয়ে হাঁস-মুরগী নিয়ে চলে আসত। এ সব ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এ ছাড়াও নাকি সাহেবরা দুজন সাঁওতাল রমণীকে জোর করে তুলে এনে প্রথমে ধর্ষণ এবং পরে খুন করেছিল। ৫ শ্রাবণ, ১২৬২ সোমপ্রকাশে যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :— "রাজমহল, ভাগলপুর, মুরশিদাবাদ, জঙ্গীপুর, অরঙ্গাবাদ, আমড়া, জিয়াগঞ্জ ইত্যাদি স্থান হইতে আমরা যে সকল পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইংরেজী পত্রে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তদ্দারা নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে সাঁওতাল জাতিরা কোনকালে রাজ-বিরুদ্ধাচরণ করে নাই, তাহারা চিরকাল রাজানুগত ও পরিশ্রম তৎপর, তাহাদিগের পরিশ্রমে রাজমহলের সর্ব্বোপরি বিচিত্র উদ্যান ও নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহারা কৃষিকার্য্যের দ্বারা প্রচুর শস্য উৎপন্ন করিতেছে, মেং পন্টেট সাহেব যে সময়ে ঐ পর্বতের রাজস্ব-বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন সে সময় কেবল ৩০০ মাত্র সাঁওতাল জাতি তথায় বাস করিয়াছিল। এইক্ষণে তাহাদিগের সংখ্যা এক লক্ষ হইয়াছে এবং দক্ষিণ পর্বত হইতে সাঁওতাল জাতি অধিক পরিমাণে আগমন করিতেছে। তাহারা বাঙালির ন্যায় ভীরু স্বভাবের নহে। বলবান ও সাহসিক। রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্মচারীরা তাহাদিগের প্রতি নানা বিধায়ে অত্যাচার করাতে তাহারা অস্ত্রধারণ করিয়াছে।

রেইলওয়ে কর্মচারীগণ হুগলী ও বর্ধমানে যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছিল তাহাতে আগেকার ভীরু স্বভাব লোকেরা কোন আপত্তি না করাতে তাঁহাদিগের সাহস বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে কিন্তু বলবান লোকেরা কেন তাহা সহ্য করিবেক? আমরা অবগত হইলাম যে রেইলওয়ে কর্মচারীরা সাঁওতাল জাতির যুবতী স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া বলাৎকার করিয়াছেন, কোন কোন স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া পাঁচ-সাত দিবস আপনাদিগের নিকট রাখিয়াছেন, তাহাদিগের উদ্যান হইতে বল দ্বারা ফল, কাষ্ঠাদি লইয়াছেন তাহার মূল্য দেন নাই। সাঁওতাল লোকদিগকে পরিশ্রম করাইয়াছেন অথচ মূল্য কিছুই দেন নাই, বলবান জাতি এত অত্যাচার কেন সহ্য করিবেন? এই বিষয়ের বিশেষ তদন্ত অতি আবশ্যক, যাহারা চিরকাল রাজানুগত, তাহারা বিনা কারণে অস্ত্রধারণ করিয়াছে, এ কথা কে বলিবেন?

ইংরেজদের এই ঔদ্ধত্যের জবাব দিতেই বিদ্রোহীরা তাদের আক্রমণ করে। তখন তারা সংখ্যায় ছিল সাত-আটজন। তারা কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। বিদ্রোহীদের আক্রমণের মুখে পড়ে তারা খড়-কুটোর মত উড়ে যায়। রেলপথ নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। পিরপাঁইতি থেকে সকরিগলি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়।

এই খবরে বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত মেজর এফ. ডাবলিউ. বারোজের উদ্বেগ চতুর্গুণ বেড়ে গেল। তিনি ভাগলপুরের কমিশনারকে লিখলেন :

"At this season men are on furlough and possibly one regiment from Danapur might not be sufficient to put down the insurgents on this side of the Damin-I-Koh, considering the extensive tract of country they occupy, its Jungly nature, bad roads and determination of the insurgents of fight as in the affair of yesterday with the European and I should therefore be glad to learn your opinion as the whether your views are for at once putting down the insurgents by force or by holding the road between Bhagalpur and Rajmahal clear from their intrusion till after the rains, and then proceeding to force them into submisson in the mean time trying to conciliation means...it seems to me that such force as can be divided in five or six parties of 400 or 500 men will be required for the work in checking the Rajmahal side of Damin."[৩৮]

অর্থাৎ "ঋতুর এই সময়ে অধিকাংশই লম্বা ছুটিতে। দেশের এক বড় অংশ এখন বিদ্রোহীদের দখলে, এলাকাটা জঙ্গলাকীর্ণ, রাস্তার অবস্থা মোটেই ভালো নয়। সর্বোপরি যুদ্ধে তাদের অনমনীয় মনোভাব, গতকালের ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষে যেটা পরিলক্ষিত হয়েছে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছে দানাপুর সেনা ছাউনি থেকে আগত একটিমাত্র বাহিনী দিয়ে বিদ্রোহ দমন করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় আমি ব্যগ্রভাবে আপনার মতামত জানতে ইচ্ছুক বিদ্রোহীদের কি শক্তি প্রয়োগ করে দমন করব নাকি বর্ষা অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ভাগলপুর থেকে রাজমহল পর্যন্ত অবরোধ তৈরি করে তাদের অনুপ্রবেশ রুখব। বর্ষা অতিক্রান্ত হলে আত্মসমর্পনে বাধ্য করব। তার আগে কিছু করতে গেলে দামিনের এই অঞ্চল থেকে বিদ্রোহীদের নিবৃত্ত করতে হলে সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করে এক্কেকটা দলে ৪০০ অথবা ৫০০ সেনার প্রয়োজন আছে।"

ভাগলপুরের কমিশনার পুনরায় দানাপুর সেনা ছাউনির কমান্ডিং অফিসার লয়েডকে যত বেশি সম্ভব আরো সেনা পাঠাতে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় গর্ভনর জেনারেলকে বিদ্রোহ দমনের জন্য উপযুক্ত পন্থা খুঁজে বার করবার অনুরোধ করলেন। ইতিমধ্যে লয়েডের কাছ থেকে খবর পেলেন যে, শাকবার্গের অধীনে ৫০০ সেনার একটি দল স্টীমারে করে ভাগলপুরের উদ্দেশ্যে রওনা

৩৮. কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনসারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭, পৃ. ২৫

হয়ে গেছে। কমিশনার ব্রাউন বিদ্রোহ দমনে মিঃ বারোজকে সাহায্যের জন্য নিযুক্ত অ্যাসিসটেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট সি, ই, চ্যাপম্যানকে সে কথা জানিয়ে দিলেন এবং আর অপেক্ষা না করে যেখানেই সম্ভব বিদ্রোহীদের গতিরোধ করবার নির্দেশ দিলেন।

দানাপুর থেকে সেনাবাহিনী এসে পৌঁছাবার আগেই পিরপাঁইতির কাছাকাছি পিয়ালপুরে মেজর বারোজের সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হয়। কিন্তু বারোজের সুশিক্ষিত এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সেনাবাহিনী সাঁওতালদের সামান্য তীর ধনুকের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। কয়েক জন অফিসার সহ ২৫ জন সিপাহী মৃত্যুমুখে পতিত হন। বারোজের সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করে কহলগাঁও-এ প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়। পূর্ণিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জি.এ. পিপার ৫৮-জন হিল রেঞ্জার্স নিয়ে নদী অতিক্রম করে পিরপাঁইতি যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু যখন তিনি শুনলেন যে, বারোজ পরাজিত হয়ে কহলগাঁও এ ফিরে এসেছেন তখন তিনি তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্তন করে কহলগাঁও অভিমুখে যাত্রা করেন। পিয়ালপুরের সংঘর্ষের যে ছবি পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :—

পিয়ালপুর লাড়াই হুয় এন।
ঘামাঘুট লাড়াই হুয় এন॥
সিপাহীক গুলিক গাড়ি কেৎ হায়রে হায়।
ফাইদক সারক গাড়ি কেৎ॥
সিপাহীক গুরঃক কান।
ফাইদ হঁক গুরঃক কান।।
ধারতীরে মায়ামগে লিঙ্গিয়েন হায়রে হায়।
সেরমারে রিমিল রাকাপ এন।।
হুডুর আতে বিলিৎ আতে।
দাঃকদ এ্গুরঃক এহপ এন।।
চুকাঃক লেকা ঝাড়ায় ঝাড়ায় হায়রে হায়।
সিপাহীক দিশাক আৎ আন।
বুরু খন সার এ্গুরঃক কান।
সেরমা মন দাঃক এ্গুরুঃক কান।।
সিপাহীক হরক এ্গেলেৎ হায়রে হায়।
ফাইদ হড়ক গেক দাড়ে এন।।
সুবা ঠাকুর সিধু কানহু ফাইদ হড়ক সাঁওতে।
গুর আকান হড়ক পান্তে কেদক হায়রে হায়।।

শ্যাম পারগানাহঁয় গুর আকান।।।
পারাগানায় আঁজেৎ এন ইয়াতে
সুবা ঠাকুর সিধু কানহু।
আডিকিন হায় হিয়াতিএঃএন হায় হায়রে।
চেৎ কিন চিকায় আদ?
বুরু চটরেকিন দহন কেদে
অনাক হুয়েন আদ।
হড় কওয়াঃক মন রাড়েজএন।
সুবা ঠাকুর তেকিন কিন মেনকেৎ হায়রে হায়।
দেশমাঝি এ দেশ পারগানা
হড়ক অনাক তেলা কেৎ।
আরহঁক তঁগে কেৎ।।
সুবা ঠাকুরতেকিন দকিন রাজাঃক মা বাড়ে।
অনা লাইতে দুডুব দরকারা।।*

*　　*　　*

পীরপাঁইতির কাছে পিয়ালপুরে।
লড়াই এর সূত্রপাত দিন দুপুরে।।
আধুনিকের সঙ্গে পুরাতনের।
বীর সিধু কানহুর সঙ্গে মেজর ব্যারোজের।।
তীরধনুকের সঙ্গে গোলাগুলির।
বীর সিধু কানহুর সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনীর।।
উভয়পক্ষেই অসংখ্য হতাহত হল।
পিয়ালপুরের মাটি রক্তে রাঙ্গা হল।।
ইতিমধ্যে আকাশে মেঘের গর্জন।
বিদ্যুতের ঝলক সঙ্গে বারি বরিষন।।
প্রথমে ঝিরঝিরে পরে মুষলধারে।।।
আকাশ থেকে বৃষ্টির নাই বিরাম
পাহাড়ের চূড়া থেকে তীর অবিরাম।।
আকাশ থেকে বৃষ্টি ফোঁটা ফোঁটা।
পাহাড়ের চূড়া থেকে তীর গোটা গোটা।।

* সিধু কানহু সান্তাড় হুল, পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু

এমতাবস্থায় ব্রিটিশ বাহিনী
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে
পথ হারিয়ে ফেলল।
সিধু কানহুর দল যুদ্ধে জয়ী হল।।
সুবা ঠাকুর সিধু কানহু
তাঁদের লোকজন নিয়ে
হতাহতের সন্ধানে প্রবৃত্ত হল।
অন্যান্যদের সঙ্গে দলের গুরুত্বপূর্ণ
শ্যামপারগানা সংঘর্ষে মারা গেল।।
তাই না দেখে সিধু কানহু মূর্ছা গেল।।।
এখন উপায় কি?
পাহাড়ের প্রান্তদেশে তাঁকে কবর দেওয়া হল।
অবশেষে সবার অশান্ত হৃদয় শান্ত হল।।
সুবা ঠাকুর সিধু কানহু
ওহে দেশ মাঝি ওহে দেশ পারগানা
বলে হায়! হায়!! করতে লাগলেন।
সমবেত সকলেই তাঁদের সঙ্গে গলা মেলালেন।।
এবং তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন
সুবা ঠাকুর সিধু কানহু
দেশের শাসক হউন
এই কামনা করি।

পিয়ালপুরে সিধু-কানহু তাঁদের দলবল নিয়ে ঘাঁটি গেড়ে অপেক্ষা করছিলেন। মেজর ব্যারোজ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সামান্য কয়েকজন ফৌজ নিয়ে পিয়ালপুর অভিমুখে রওনা হন। সিধু-কানহুর দল দূর থেকে তাঁদের আসতে দেখে তাঁদের জন্য জায়গা করে দেন অর্থাৎ ঘাঁটি ছেড়ে পাহাড়ের উপরে উঠে যান। বর্ষাকাল, আকাশে মেঘ ছিলই। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ চমকাতে শুরু করে কিছুক্ষণের মধ্যেই বৃষ্টি শুরু হয়, অপরদিকে সেনাবাহিনী পাহাড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে বৃষ্টির মত ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আছড়ে পড়তে থাকে। ইংরেজবাহিনী Rain, Rain (বৃষ্টি, বৃষ্টি) মেন, মেন (পালাও, পালাও) বলে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল বটে, কিন্তু দলেব গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শ্যাম পারগানা নিহত হলেন। হুলের রচয়িতা অরুণ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, শোনা যায়, বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা পাড়ের কোলার শ্যাম পরগনায়েতকে মিলিটারি

কর্তৃপক্ষ নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে। ইডেন সাহেব অনুমোদন করেননি। বিশাল ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী শ্যাম টুডুর নিরাবরণ রক্তাপ্লুত দেহ দেখে নিজের গায়ের কোর্ট খুলে ওই উপজাতীয় নেতার দেহ আবৃত করেছিলেন। মাথা থেকে টুপি নামিয়ে অভিবাদনও করেছিলেন।

মেজর শাকবার্গ দানাপুর থেকে তাঁর অধীনস্থ সেনাবাহিনী নিয়ে ইতিমধ্যে জলপথে ভাগলপুরে এসে পৌঁছলেন। কমিশনার ব্রাউন শাকবার্গকে যা কিছু প্রয়োজন সঙ্গে নিয়ে তৎক্ষণাৎ কহলগাঁও-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার নির্দেশ দিলেন। একইসঙ্গে ভাগলপুরের কালেক্টরকে বললেন সপ্তাহে একদিন কহলগাঁওএ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাঠাতে। পরমুহূর্তেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। ভাগলপুরে তখন ছিল রেঞ্জার্সের একটি মাত্র বাহিনী জেল, কাছারি এবং কোষাগারের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল। কিন্তু কমিশনার খবর পেয়েছেন বিদ্রোহীরা ভাগলপুরের ২০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত বারকোপ, ডুমকা এবং ভুরিয়া লুঠ করে ভাগলপুর অভিমুখে রওনা দিয়েছে। তাই তিনি শার্কবার্গকে ভাগলপুরের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে কহলগাঁও-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে নির্দেশ দিলেন। মেজর শাকবার্গ নিজে একদল সৈন্য নিয়ে ভাগলপুরে থেকে গেলেন এবং অন্য একদল সৈন্যকে লেফটেন্যান্ট রুবির অধীনে স্টীমারে করে কহলগাঁও-এ মেজর বারোজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কমিশনার বারোজকেও ভাগলপুরের নিরাপত্তার জন্য সেনা পাঠাতে বললেন। এতদসত্ত্বেও ব্রাউন নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। দানাপুর সেনা ছাউনির কমান্ডিং অফিসারকে বিদ্রোহ দমনের জন্য আরো কিছু পদাতিক, অশ্বারোহী এবং কামান পাঠাতে বললেন। বাংলা প্রেসিডেন্সির গভর্নর জেনারেলকেও একই অনুরোধ জানালেন। ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এবং অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্রোহ দমনের জন্য ভাগলপুরের বাইরে ছিলেন। অপরদিকে রাজমহলের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহ নিত্য নতুন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। দলে দলে মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কমিশনার ব্রাউনের একার পক্ষে অবস্থার সামাল দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে না দেখে নিজের দায়িত্বে আর. এন. শোরকে আপাতত ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করলেন। পাটনার ম্যাজিস্ট্রেটকে লিখলেন বাড়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এফ. ভিনসেন্টকে বাড়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব নিয়ে বিদ্রোহ দমনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে নির্দেশ দেওয়া হউক।

ভাগলপুরের নব নিযুক্ত কমিশনার সি. এফ. ব্রাউন বিদ্রোহের খবর পেয়ে বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়ে ওঠেন। একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে তৎপর মনে হলেও তিনি যে যথেষ্ট বিব্রত এবং বিদ্রোহের

খবরে যারপরনাই উদ্বিগ্ন উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সত্য সহজেই ধরা পড়ে। তিনি প্রথমেই একটা নির্দেশ দিয়ে পর মুহূর্তেই সেটা যথেষ্ট মনে না হওয়ায় পরিবর্তন করেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিঠি লিখেছেন। ভাগলপুরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন আবার পরমুহূর্তেই সেটা যথেষ্ট মনে না হওয়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করবার জন্য সেনা কর্তাদের অনুরোধ করছেন। ডাক ব্যবস্থার গণ্ডগোলের আশঙ্কায় duplicate চিঠি লিখে ঘুর পথে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর চাহিদা মত দানাপুর থেকে ভাগলপুরে সেনাবাহিনী এসে পৌঁছবার পরেই সেটা যথেষ্ট মনে না হওয়ায় পুনরায় সেনা পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। বিদ্রোহ দমনে ভাগলপুরের কার্যনির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এবং অ্যাসিসটেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠিয়ে নিজেকে অসহায় মনে করে নিজে দায়িত্ব নিয়ে তাকে সাহায্য করবার জন্য পুনরায় ম্যাজিস্ট্রেট এবং অ্যাসিসটেন্ট ম্যাজিস্টেটকে নিয়োগ করেছেন। তিনি নিজেই এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন :

"Since the outbreak commenced I have not had a night rest for reports are comming in at all houis and required immediate attention."[৩৯]

অর্থাৎ বিদ্রোহ শুরু হবার পর থেকেই রাতে ঘুম নাই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিদ্রোহের খবর আসছে এবং যত শীঘ্র সম্ভব মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। প্রশাসনের এই ল্যাজে গোবরে অবস্থা নিম্ন বর্ণিত লেখায় নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বিদ্রোহ নিত্য নতুন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে। আতঙ্কিক লোকজন নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছোটোছুটি করছে। বিদ্রোহীরা গ্রামের পর গ্রাম লুট করে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত অসামরিক কর্তা ব্যক্তি সুনামের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে নিজেদের হাস্যস্পদ করে তুলেছিলেন—হান্টারের লেখায় তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় :

"But in so doing, it over looked the difference between a collector of Mr. keating School in 1788, and a collector of 1855. Mr. Keating knew nothing of Jurisprudence, but he selected the passed to be held, distributed troops, and regulated their movements with consumat ability. The collector of 1855 was a more able lawyer, and administered his district with much cleaner hands, but he knew nothing of military tactics ; and for the duties now developed upon him, he had not, and never

৩৯. কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনসারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭, পৃ. ২৮

pretend to have, any capacity. His military disposition made him ridiculons in the eyes of the soldiers sent to act under him, dissension reigned within the Enligh camp and the rebels plundered and massacred at pleasure outside.[৪০]

অর্থাৎ, "কিন্তু সেটা করতে গিয়ে 1788 খৃষ্টাব্দের মিঃ কিটিংসের ইস্কুলের কালেকটর এবং ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের কালেকটরের মধ্যে যে তফাৎ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে সেই পার্থক্যের নজর এড়িয়ে গেল। মিঃ কিটিংস ব্যবহার শাস্ত্র সম্বন্ধে কোনো কিছুই অবহিত ছিলেন না, কিন্তু তিনি রাস্তা অবরোধের জায়গা নির্দিষ্ট করেছিলেন, সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করলেন এবং তাঁর দক্ষতা দিয়ে তাদের গতিপথ নির্দেশ করে দিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের কালেক্টর ছিলেন আগের তুলনায় অনেক বেশি আইনজ্ঞ নিঃসন্দেহে এবং তিনি অনেক বেশি দক্ষতার সঙ্গে তার অধীনস্থ অঞ্চলের শাসন কার্যে পারদর্শী ছিলেন কিন্তু সামরিক কলাকৌশল বিষয়ে তিনি একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁর উপরে যে দায়িত্ব অর্পিত হল, সে সম্বন্ধে তিনি মোটেই অবহিত ছিলেন না, সেটা তিনি স্বীকার করলেন না বা না জানার ভানও করলেন না। সামরিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ইংরেজ বাহিনীর কাছে তাকে হাস্যস্পদ করে তুলল, ইংরেজ বাহিনীর ক্যাম্পের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিল। বিদ্রোহীরা মনের আনন্দে ক্রমাগত লুটপাট এবং বিধ্বস্ত করতে লাগল।"

বিদ্রোহের খবর তাঁদের কাছে বিনামেঘে বজ্রপাতের মত মনে হল। বিদ্রোহ দমন করতে নেমে বিদ্রোহের ব্যাপকতা প্রত্যক্ষ করে তাঁরা দিশেহারা হয়ে পড়লেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সত্যই প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন লেখক সাঁওতাল বিদ্রোহকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন, কারো কারো মতে সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল খণ্ড জাতির বিদ্রোহ আবার অনেকের মতে স্থানীয় হাঙ্গামার বেশি কিছু নয়। কিন্তু তাঁরা যে সঠিক নহেন, এ কথা উপরোক্ত অধ্যায়ে আলোচিত প্রশাসনের ল্যাজে গোবরে অবস্থা থেকে সহজেই প্রমাণিত হয়। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সাঁওতাল বিদ্রোহকে যে, কোনো অবস্থাতেই খণ্ড জাতির বিদ্রোহ বা স্থানীয় হাঙ্গামা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এতদসত্ত্বেও যাঁরা সাঁওতাল বিদ্রোহকে খণ্ড গাতির বিদ্রোহ বা স্থানীয় হাঙ্গামা বলে ব্যঙ্গ করেন. সন্দেহ করেন, সেইসব সন্দেহ বাতিকদের জন্য W. B. Oldham এর কাজজয়ী উক্তি তুলে ধরছি :

"It (the yearning for independance) is not the popularly

৪০. ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার, দি অ্যানালস অব রুলাল বেঙ্গল, পৃ. ১৬৯

received causes of the insurrection of 1855; but after reading all the correspondance connected with the introduction of the Santals into the Damin-I-Koh, and its adminstration by Mr Pontet till the rising the large part which this idea and hope played in that outbreak become plains to my mind the movement so originated drew to it all there whose patriotism was stimulated by the recollection of there suffering at the hands of the usurers and the police, but the fundamental idea at work and that which was attempted to be put in practice was the establishment of a Santal realm and kingdom."*

'বিদ্রোহের গতিপথ রোধ করার জন্য কড়া প্রহরার আয়োজন"

অল্প সময়ের ব্যবধানে বিদ্রোহ এক বিরাট অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিহার প্রদেশের অন্তর্গত গোড্ডা, পাকুড়, মহেশপুর ওদিকে মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম পর্যন্ত এক বিরাট অঞ্চল বিদ্রোহীদের দখলে চলে আসে। বীরভূমে বিদ্রোহ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। বীরভূমের নলহাটি, রামপুরহাট, নাগোর, সিউড়ি, লাঙ্গুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চল বিদ্রোহীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এককথায় ভাগলপুর এবং বীরভূমের মধ্যবর্তী সমস্ত এলাকাই বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। তাদের সামনে সব বাধাই তুচ্ছ। সদ্য জয়লাভের নেশায় তাদের মনোবল তুঙ্গে। তাঁরা দুর্দান্ত; দুঃসাহসিক। বিদ্রোহীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকল। তাঁরা একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে অভিযান চালাতে লাগল। ১১ জুলাই গোড্ডায় অবস্থিত নীলচাষী মিঃ জন ফিজপেট্রিক ভাগলপুরের কমিশনারকে উদ্দেশ্য করে লিখলেন :

"That a fearful panic had seize the inhabitants of that neighbourhood since the parpatration of the barbarous murders on the 7th instant and that six bands of Santals to the amount (number) of seven thousands—not under so—are proceeding to the place where the pretended soobah has set up his standard and they have threatened the Bengalees residing in those parts that they will return with an order from the soobah for their extermination."[৪১]

অর্থাৎ সাত সাতটা বর্বর হত্যাকাণ্ডের পর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের

*Bihar district gazetteers Santal Pargana, P C. Roychoudhury, পৃ. ১১৯

৪১. কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনসারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭, পৃ. ৩০

মধ্যে ভয় মিশ্রিত আতঙ্ক দেখা দিয়েছে, এবং সাঁওতালদের ঐ ছ'টি বাহিনী যাদের সংখ্যা সাত হাজার এর নীচে নয়ই—তাদের নকল নবীশ সুবেদার যেখানে ঘাঁটি গেড়েছে সেইদিকে যাচ্ছে এবং এতদঞ্চলে বাসবাসকারী বাঙালিদের ভয় দেখাচ্ছে, আর বলছে তারা তাদের সুবেদারের কাছ থেকে ফরমান এনে সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করবে।

এসব খবর শুনে ভাগলপুরের কমিশনারের heartbeat (হৃৎস্পন্দন) চতুর্গুণ বেড়ে যায়। ব্রাউন ইতিপূর্বে অনেক ভুল কাজ করলেও, এইবারে একটা বুদ্ধিমানের কাজ করলেন। বিদ্রোহ যাতে দামোদর নদী এবং গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোডের আরো দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তাই তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত সামরিক বাহিনীকে সেই সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়োগ করে বিদ্রোহীদের অগ্রগতিকে রোধ করতে সচেষ্ট হলেন। বাংলাদেশে একসময় ডাকাতদের উৎপাত ভীষণভাবে বেড়ে যায়, একথা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানে। তাই আলাদাভাবে এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে সেটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। ক্রিস্টোফার কিটিং যিনি একজন সামান্য কর্মচারী হয়ে কলকাতায় এসেছিলেন তখন বীরভূমের কালেক্টর ডাকাতি প্রতিহত করতে অথবা ডাকাতি করে তার নাগালের বাইরে চলে না যায় তাই তিনি তার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ভাগলপুরের নবনিযুক্ত কমিশনার ব্রাউনও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

"As we have already seen the 7th and the 31st regiment N.I. had been employed on the Murshidabad border, and the hill rangers, and portions of the 40th, the 42nd and the 13th regiment N.I. coming from Danapur, had been engaged towards Bhagalpur and Colgong. Garrison, Post of the 7th and the 31st regiments N.I. and the Nizamat troops, were kept at Pakur, Phudkipur and some neighbouring places, protecting the country on eitherside of the Murshidabad border from Birbhum boundary to the Ganges river."[৪২]

অর্থাৎ, যেহেতু আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে, সেনাবাহিনীর সপ্তম এবং একত্রিশতম দেশীয় পদাতিক বাহিনীকে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে নিয়োগ করা হয় এবং হিল রেঞ্জার্স এবং চল্লিশতম বাহিনীর একটা অংশ, বিয়াল্লিশতম এবং ত্রয়োদশ বাহিনীর দেশীয় পদাতিক বাহিনী যারা দানাপুর থেকে বিদ্রোহ দমন

৪২. কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনসারেশন অব ১৮৫৫-৫৭, পৃ. ৩৭

করতে আসছে তাদের ভাগলপুর এবং কহলগাঁও-এর নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত করা হয়। দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সপ্তম এবং একত্রিশতম বাহিনী এবং নিজামের বাহিনীকে যথাক্রমে পাকুড়, ফুদকিপুর এবং পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলে নিয়োগ করা হয়। এই ভাবে বীরভূমের সীমান্ত থেকে শুরু করে গঙ্গা নদী পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের সীমান্তকে দু' দিক থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ঘিরে দেশকে বিদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা করা হয়। তার সঙ্গে তিনি আর একটা কাজ করলেন। সেটা হল :

"In order to prevent the advance of the Santals to the south of the Damodar river and of the Grand Trunk Road, and also to protect the adjacent territories, the Ramgurh Irregular light Horse, the Governor Generals Bodyguard, the 35th regiment, and 200 Nizamat Sepoys from the Guard of the Nawab of Murshidabad with 30 of his elephants beside 32 horses, and subsequently the 63rd Regiment N.I. had been put in motion"[৪২]

অর্থাৎ, "দামোদর নদী এবং গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোডের দক্ষিণে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করতে এবং তাদের হাত থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য রামগড়ের অনিয়মিত ঈষৎ অচল অশ্বারোহী বাহিনী, গর্ভনর জেনারেলের দেহরক্ষী, ৩৭ নং রেজিমেন্ট এবং মুর্শিদাবাদের নবাবের পাহারায় নিযুক্ত ২০০ নিজামত সেপাই ছাড়াও ৩০টি হাতী এবং ৩২টি ঘোড়া এবং এই ভাবে ৬৩তম দেশীয় পদাতিক বাহিনীকে সক্রিয় করে তোলা হল।"

ভাগলপুরের নব নিযুক্ত কমিশনার ব্রাউন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে প্রহরার ব্যবস্থা করে একটাই বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন, সেটা হল সীমান্তে সেনাবাহিনীকে টহলদারির জন্য নিযুক্ত করা। তাঁর এই পরিকল্পনার ফলেই দেশের অন্য প্রান্তে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তাই এ কথা আজ নিঃসন্দেহ এবং দিনের আলোর মতই পরিষ্কার যে, সেদিন যদি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় অবরোধ তৈরি না করে উন্মুক্ত করে দেওয়া হত, তাহলে যে হারে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ছিল, তাতে অচিরেই বাংলা প্রেসিডেন্সির এক বিরাট অংশ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠত।

দেশের অন্য অংশকে বিদ্রোহ ছড়াবার হাত থেকে প্রতিহত করতে সমর্থ হলেও কমিশনার ব্রাউন অভ্যন্তরীণ অংশকে অগ্নিগর্ভ হবার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেননি। বিদ্রোহীদের ক্রমাগত অংশগ্রহণের ফলে বিদ্রোহ দুর্বার হয়ে ওঠে। অম্বর পরগণার অন্তর্ভুক্ত লক্ষণপুরের সিংরাই মাঝির দল গোচোর সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মিলিত বাহিনী লক্ষণপুর লুটপাটের পর লিটিপাড়া অভিমুখে রওনা হয়। লিটিপাড়ায় তখন ইশরি ভকত ও তিলক ভকত নামে দুজন কুখ্যাত

মহাজনের বাস ছিল। সাঁওতালদের শোষণ করে তাঁরা বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু সাঁওতালদের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁরা তাদের গোমস্তা ঠুঁঠা ভকতকে সমস্ত কিছু তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়ে কেটে পড়েছিলেন। ঠুঁঠা সাঁওতালদের উপরে নির্যাতনের ক্ষেত্রে তাঁর মালিকদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা ইশরি এবং তিলক ভকতের দোকান নির্বিচারে লুটপাট করে তাদের গোমস্তা ঠুঁঠা ভকতকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এরপর বিদ্রোহীরা জিতুপুরে এসে উপস্থিত হয। জিতুপুরে কয়েকজন ধনী ময়রার বাস ছিল। সাঁওতালদের আগমনের খবরে ময়রারা একটা মহুয়া গাছের কোটরে ঢুকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সাঁওতালদের দিকু অনুচররা সেকথা সাঁওতালদের কাছে প্রকাশ করে দিতেই বিদ্রোহীরা খোঁচা মেরে মেরে তাদের সবাইকে হত্যা করে। করণ ঘাটির মানিক শুঁড়ি এবং তার ছেলেকে খেলা সাঁওতাল নামে একজন বিদ্রোহী তীরধনুক দিয়ে হত্যা করে। অতঃপর সাঁওতালরা হিরনপুর বাজার অভিমুখে যাত্রা করে। হিরনপুর লুটপাটের পর মানসিংপুরে এসে উপস্থিত হয়। এখানেই অপর বিদ্রোহী দলের নেতা অম্বর পরগণারই অন্তর্ভুক্ত ফরাসডির ত্রিভুবন সাঁওতালের দলের সঙ্গে বিদ্রোহীদের বাহিনী মিলিত হয় এবং সম্মিলিত বাহিনীর শক্তি কয়েকগুন বৃদ্ধি পায়। এর পরেই নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের একটা বড় অংশ সাঁওতাল বিদ্রোহীদের দলে নাম লেখায় এবং সম্মিলিত বাহিনী পাকুড়ের দু মাইল উত্তরে সংগ্রামপুর অভিমুখে যাত্রা করে। সেখানে রহমদি মণ্ডল নামে এক সম্পন্ন মুসলমান জোতদারের বাড়িঘর লুঠ করে জ্বালিয়ে দেয়।

উপরে বর্ণিত ঘটনা সমূহকে সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে একটা সত্যই বেরিয়ে আসে. তা হল বিদ্রোহীদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য আপামর জনসাধারণ নয়, ছিল জোতদার, জমিদার, মহাজনী কারবারী এবং তাদের মদতদাতা অসৎ সরকারি কর্মচারী। তাই বিদ্রোহীরা তাদেরকে খতম করবার অভিযানে নেমেছিলেন এবং এই কাজে তাদের সক্রিয় ভাবে সাহায্য করেছিলেন তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় হিন্দু সম্প্রদায়। হিন্দু হয়েও যারা হিন্দুদের কাছে উৎপীড়িত হচ্ছিলেন। তাদের অবস্থা সাঁওতালদের তুলনায় কোনো অংশেই ভালো ছিল না। খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের এই ঐক্যবদ্ধরূপ প্রত্যক্ষ করে শাসকশ্রেণী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন, তাই এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ফাটল ধরাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। বাংলার কোম্পানী সরকারের অনুমোদন নিয়ে ২৩ জুলাই এক নির্দেশে বলা হল :

"Other castes of persons besides Santal who may take up arms against the peaceable subjects to Goverments are to be considered rebels in like manner and treated accordingly."[৪৩]

৪৩. কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনসারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭, পৃ. ৪১

অর্থাৎ, "সাঁওতাল ছাড়া অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক সরকারের অনুগত এবং শান্ত প্রজাদের বিরুদ্ধে যদি অস্ত্রধারণ করে তবে তাকে পুরোপুরি বিদ্রোহী হিসেবেই গণ্য করা হবে এবং সেই ভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"

বলা বাহুল্য, সরকারের এই আবেদনে কেউ সাড়া দেয়নি। তাদের উৎসাহে কোনো ভাঁটা পড়েনি। পরবর্তীকালে (১৫ আগস্ট, ১৮৫৫) একই উদ্দেশ্য নিয়ে অনুরূপ আর একটি আবেদন সরকার সাঁওতালদের কাছে রেখেছিলেন। কিন্তু সাঁওতালরা সেই আবেদনকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান শুধু নয় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তাতে থুতু দিয়ে রাস্তার পাশে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন পরাধীনতার চেয়ে লড়াই করে মৃত্যুবরণ অনেক বেশি সম্মানের।

সিধু-কানহু কর্তৃক পাকুড় অবরোধ

সংগ্রামপুর লুটের পরেই সিধু, কানহু, চাঁদ এবং ভৈরবের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী পাকুড়ের অভিমুখে যাত্রা করে। জমিদারের দেওয়ান বাবু জগবন্ধু রায় ছিলেন কাঞ্চনতলার অধিবাসী। সাঁওতালদের আগমনের সংবাদ পেয়েই তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। সাঁওতালদের সম্ভাব্য আক্রমণের হাত থেকে গ্রামকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি গ্রামবাসীদের সবাইকে জমিদারের দালান বাড়িতে আশ্রয় নিতে বললেন এবং যত বেশি সম্ভব ইঁট পাটকেল যোগাড় করে বাড়ির ছাদে জড়ো করতে বললেন। অপর দিকে রোশন মাহুতকে হাতীর পিঠে চাপিয়ে জঙ্গীপুর পাঠিয়ে দিয়ে বললেন যত বেশি সম্ভব বারুদ কিনে আনতে। কিন্তু রোশন যখন সামান্য কিছু বারুদ নিয়ে, বৃষ্টি মাথায় করে সন্ধ্যা নাগাদ গ্রামে পৌঁছলেন তখন বাবু জগবন্ধু রায় গ্রামবাসীদের কাছে তাঁর অসহায়তার কথা জানালেন, এবং বললেন, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদের করতে। এ কথা শুনে সমবেত জনতার মধ্যে হুলস্থূল পড়ে গেল। সাঁওতাল হুলের লেখক বাবু দিগম্বর চক্রবর্তীর লেখায় সেদিনের জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায় :

"Then there arose loud wailing of the female, children shrieked and screamed men talked nonsense and rushed hither and thither without any fixed aim, father left aside their crying children unheeded ; no one care for the old, the infirm and the sicky. There was tying and untying of bundles everything turn upside down and mixed up helter and skelter promisciously. In short a confused and heart rending seen ensured which can

be better imagine then described. We were at the time only six years of age, yet we remember vividly the scene of that hour of general woe and confusion and the impression left in our mind will never be obliterated. The fear and anxiety with which the terrible long night passed away begger any description. But long before the day dawned almost the whole village became empty...... In this sad plight the villagers left their homes not knowing where to go, what food to give to the children when they would cry for hunger. All the eatables, all the money, utensils, & furniture in short everything they possessed was left behind, their only object being to put as much distance as possible between the santals and themselves."[88]

অর্থাৎ, তখন সেখানে কান্নার রোল উঠল। মহিলারা উচ্চস্বরে বিলাপ করতে শুরু করলেন, বাচ্চারা ভয়ে আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল। লোকেরা আজেবাজে বকতে লাগলেন, উদ্দেশ্যহীন ভাবে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগলেন। বাবা তার ছেলের কান্নায় কান না দিয়ে ছেলেকে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। বৃদ্ধ অসহায়, অসুস্থদের কথা কেউ চিন্তাই করলেন না। ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন, বাঁধাছাঁদা অবস্থায় যা কিছু ছিল সবকিছু বাছ্-বিচারহীন অবস্থায় গাদাগাদি করে জড়ো করা হল। এক কথায় বলতে গেলে সমবেত জনতার মধ্যে বিভ্রান্তি এবং হৃদস্পন্দন দেখা দিল যাকে বর্ণনা করার চেয়ে কল্পনা করেই সঠিকভাবে উপলব্ধি করা যায়। তখন আমার বয়স ছয় বছর ছিল। কিন্তু তাহলেও সেদিনের দুঃখ এবং ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা স্পষ্ট মনে আছে, সেদিনের ঘটনা মনের উপরে যে ছাপ রেখে গেছে তা কোনোদিন ভুলবার নয়। ভয় এবং আতঙ্কের মধ্যে রাতটা কিভাবে যে কাটল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু ভোর হতেই সবাই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।.........এইরকম অবস্থায় সব কিছু পেছনে ফেলে তারা চললেন। তারা জানে না কোথায় যাবে, বাচ্ছাদের ক্ষিদে পেলে কি খাওয়াবে, কারণ খাবার দাবার, টাকাকড়ি, বাসনকোসন, আসবাবপত্র এক কথায় যা কিছু তাদের ছিল সবই পিছনে ফেলে চলে এসেছেন। তাদের একটাই লক্ষ্য, একটাই উদ্দেশ্য সাঁতালদের নাগাল থেকে যতদূর সম্ভব দূরে চলে যাওয়া।

এক বিশাল জনতা গঙ্গা অতিক্রম করে নিরাপদ দুরত্বে যেতে চায়। তখন বর্ষাকাল। বর্ষায় গঙ্গার জল বৃদ্ধি পেয়ে পাকুড়ের অনতিদূরে বল্লভপুর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। নৌকার দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না। দু' একটা যাও বা

৮৮. সূত্র, কে. কে. দত্ত, দি, সাম্থাল ইনসারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭, পৃ.—৩২

পাওয়া যাচ্ছিল অত লেককে একসঙ্গে নদীর অন্যপারে নিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছিল। কদমসায়েরের নীল চাষী চার্লস মাসেক আতঙ্কিত লোকজনকে নৌকো দিয়ে সাহায্য করে বিরাট উপকার করেছিলেন।

সিধু-কানহুর দল তিনদিন ধরে (৭২ ঘণ্টা) পাকুড় অবরোধ করে রাখবার পর চতুর্থ দিনে সিধু-কানহু, চাঁদ এবং ভৈরব জমিদারের অন্দর মহলে প্রবেশ করেন। কিন্তু মূল্যবান তেমন কিছুই পেলেন না। কারণ গৃহদেবতা মদনমোহনকে তার গয়নাগাঁটি সহ রানী ক্ষেমাসুন্দরী প্রথমে জঙ্গীপুরে গিয়েছিলেন পরে সেখান থেকে তাঁব জমিদারীর অন্তগর্ত ঝিকরহাটিতে চলে আসেন এবং বিদ্রোহ থামবার আগে পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। শান্তি শৃংখলা ফিরে এলে তিনি পাকুড়ে আসেন এবং পাকুড়ের সর্বস্ব খোয়ানো লোকজনকে পুনর্বাসনের জন্য সবরকমের সাহায্য করেছিলেন।

বিদ্রোহী জনতা পাকুড় লুটপাট এবং বিধ্বস্ত করে। রাধানাথ পাণ্ডে নামে একজন শয্যাশায়ী প্যারালিসিস রোগী এবং লক্ষণ মন্ডল নামে একজন খোঁড়া ব্যক্তি যারা অন্যদের সঙ্গে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়নি তাদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। কিন্তু দুজন বৃদ্ধকে হত্যা করা দূরে থাক খাদ্য এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল।

দীনদয়ালের প্রত্যাবর্তন এবং পাকুড়ের স্বঘোষিত জমিদার"

সাঁওতাল বিদ্রোহীর দল পাকুড় ছেড়ে চলে যাবার পরেই এলাকার সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত ধনী মহাজনী কারবারী দীনদয়াল রাই তাঁর ভাই নন্দকুমার এবং ভগ্নী বিমলা রাইকে নিয়ে পাকুড়ে ফিরে আসেন, সঙ্গে গুটিকয় অনুচরবর্গ, সৃষ্টিধর পোদ্দার, নীলকমল মণ্ডল, এবং যাদব মন্ডল। পাকুড় ছেড়ে যাবার আগে তিনি তাঁর অসদুপায়ে উপার্জিত ধনরত্ন মাটির তলায় পুঁতে রেখেছিলেন। সেগুলি অক্ষত অবস্থায় পেয়ে আনন্দে আর্তনাদ করে উঠলেন। পাকুড়ের জমিদারের অনুপস্থিতিতে তিনি নিজেকে স্বদর্পে জমিদার বলে ঢ্যাড়া পিটিয়ে ঘোষণা করে দিলেন। সাঁওতালি গ্রামের জোয়ান এবং সমর্থকরা সবাই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই সুযোগে দীনদয়ালের অনুচররা রোজ সাঁওতাল গ্রামে ঢুকে অবলা অসহায়দের উপর নির্যাতন চালাতেন। দীনদয়াল অবশ্য তাঁর কৃতকর্মের ফল দু একদিনের মধ্যেই পেয়ে গেলেন। একদিন তিনি তাঁর ভাই নন্দ কুমার এবং ভগ্নী বিমলাকে নিয়ে পাকুড়ের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত চৌধুরী পুকুরে স্নান করতে নেমেছিলেন। এমন সময় দেখা গেল একপাল গরু লেজ উঁচিয়ে

জঙ্গলের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে। নন্দকুমার তাঁর দাদা দীনদয়ালকে সে কথা জানিয়ে দিলেন। দীনদয়াল জবাব দিলেন বাঘের তাড়া খেয়ে গরুর পাল ছুটে পালাচ্ছে, বলেই স্নান করতে লেগে গেলেন। অল্প কিছুক্ষণ পরেই অকস্মাৎ সাঁওতাল বিদ্রোহীদের বিরাট একটি দলকে পুকুরের দিকে আসতে দেখা গেল। নন্দকুমার তাঁদের দেখতে পেয়েই পালিয়ে আয় দাদা বলে পালিয়ে গেলেন। বিমলাও কাছেই একটা গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। দীনদয়াল জলে নেমেছিলেন এবং স্থূল শরীর নিয়ে পালাতে পারলেন না। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীর দল তাঁকে ঘিরে ফেলেছে, তিনি তাদের হাতে পায়ে ধরে তাঁকে ছেড়ে দেবার জন্য আবেদন জানালেন, কিন্তু তাঁর অত্যাচারের কথা স্মরণ করে কেউ তাঁর আবেদনে সাড়া দিলেন না। তাঁর পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হল। জগন্নাথ সর্দ্দার নামে তাঁর এক প্রাক্তন চাকর বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। দীনদয়ালের পুরোনো হিসাব-কিতাব চুকিয়ে দিতে তিনি টাঙ্গি হাতে এগিয়ে এলেন। টাঙ্গির এক কোপে আঙুল কেটে তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, এই আঙুল দিয়ে তুমি সুদের টাকা গুনেছ, হাত দুটো কেটে দিয়ে তিনি বলেছিলেন, এই হাত দিয়ে তুমি বহু ক্ষুধার্ত শিশুর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ, তারপরে ধড় থেকে মাথা আলাদা করে বিদ্রোহীরা সেই কাটা মুণ্ডু পাকুড়ের অনতিদূরে অবস্থিত চক্রপানিশ্বর মন্দিরের কুলুঙ্গিতে রেখে দিয়েছিল। তার চারপাশটা রক্ত দিয়ে রাঙ্গিয়ে দিয়েছিল। সেই রক্তের দাগ বহুদিন পর্যন্ত সেখানে ছিল।

এরপর বিদ্রোহীর দল বল্লভপুর অভিমুখে যাত্রা করে। সেখানে ঘনশ্যাম ময়রা নামে একজন কর্মকার এবং দুজন বৈরাগীকে হত্যা করে। দুজন মুসলমান ফকির বটগাছের তলায় রান্না বসিয়েছিলেন বিদ্রোহীদের দল তাদেরও হত্যা করে বলে খবরে জানা যায়।

বল্লভপুর বিধ্বস্ত করার পর বিদ্রোহীরা কালিকাপুর, বল্লভপুর, বলিহারপুর, শাহাবাজপুর এবং নীবননগর লুটপাট ও বিধ্বস্ত করার পর আরো পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে মুর্শিদাবাদ সীমান্তের প্রায় কাছাকাছি পৌছে গেলেন।

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টুগুড ৪০০ শ' সৈন্যের একটা দল নিয়ে আগেই বহরমপুর থেকে ঔরঙ্গাবাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি সাঁওতাল বিদ্রোহীদের আগমনের সংবাদ পেলেন তখন তিনি ধুলিয়ানে মিঃ এইচ. মাসেকের নীলকুঠিতে আশ্রয় নেন এবং ১৬১ জনের একটা দলকে এইচ. মাসেকের ভাই সি. মাসেকের কদমসায়েরের নীলকুঠির নিরাপত্তার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। বিদ্রোহীরা অম্বর পরগনার অন্তর্গত ঝিকরহাটির কাছারী বাড়ি লুঠ করে কদমসায়েরের সি. মাসেকের নীলকুঠি আক্রমণের পরিকল্পনা করে।

কিন্তু মাসেক দুজন ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহীদের ঢুকবার প্রধান রাস্তায় নালার মধ্যে একটা নৌকায় পাখি-মারার বন্দুক নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সাঁওতালদের দেখা মাত্রই তিনি গুলি ছুঁড়তে শুরু করেন, ফলে কয়েকজন বিদ্রোহী আহত হলে বিদ্রোহীরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছু হটতে শুরু করে। কদমসায়ের এই আক্রমণের খবর ধুলিয়ানে পৌঁছালে সপ্তম রেজিমেন্টের দেশীয় পদাতিক বাহিনী কদমসায়ের অভিমুখে যাত্রা করে; কিন্তু বিদ্রোহীরা সেনাবাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে পলসা অভিমুখে পালিয়ে যায়। সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের পিছু পিছু ধাওয়া করে কিন্তু বিদ্রোহীরা গ্রেপ্তার এড়িয়ে মহেশপুরে চলে যায় এবং মহেশপুরের রাজবাড়ী লুটপাট এবং বিধ্বস্ত করে।

সপ্তম রেজিমেন্টের দেশীয় পদাতিক বাহিনী অবশেষে সাফল্য লাভ করে। ১৫ জুলাই সকালে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ৩০০০/৪০০০ হাজার বিদ্রোহীর একটা দলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে সাঁওতাল বিদ্রোহীর দল পরাজিত হয়। সিধু-কানহু, চাঁদ এবং ভৈরবও সামান্য আহত হন। কিন্তু তাদের মনোবলে কোনো রকমের চিড় ধরেনি।

পাকুড়ের কাছাকাছি তরাই নদীর তীরে সপ্তম রেজিমেন্টের দেশীয় পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে ৫০০০ হাজার বিদ্রোহীর একটা দলের মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে বিদ্রোহীরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়, বিদ্রোহীদের অনেকেই হতাহত হন কিন্তু সেনাবাহিনীকে কোনোরকম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়নি।

ত্রিভুবন সাঁওতালের অন্য একটি দল কয়েকজন ইউরোপীয়ান এবং মজুর হাটির চারজন কর্মকার, লাল লোহার, প্রীতরাম লোহার, হীরা লোহার এবং মতিরাম লোহারকে হত্যা করে। মোতিরাম লোহার নামে একজন চৌকিদার এদের কয়েকজনকে স্পেশাল কমিশনারের নিকটে সনাক্ত করতে সমর্থ হন। তিনি অভিযোগ করেন, বোরিওর ত্রিভুবন এবং মানসিং মাঝি, মজুরহাটির রূপু মাঝি, দেশ মাঝি এবং ছোট কাঁকজলার তুঁবু পরগনাইতরা পাটনায় বাংলোর সামনে জড়ো হয়েছিলেন কয়েকজন ফৌজ যোগাড় করার উদ্দেশ্যে। বারমাসিয়ার মেঘু মাঝিও তাদের সঙ্গে যোগদান করে। রূপুর ভাই চাকলাদার রুচকা পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন। মজুরহাটির সিং রাইও নেতা হিসেবে এই দলে ছিলেন। এরা সবাই ভুঞইয়া পাড়ার অভিমুখে যাত্রা করেছিল। সেখানে তারা দুজন সাহেবকে একটা হাতীর পিঠে এবং একজনকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে মহারাজপুরের দিকে পালিয়ে যেতে দেখে। বিদ্রোহীর দল তাদের দেখতে পেয়ে ঘিরে ধরে এবং হাতীর পিঠ থেকে নেমে আসতে বলে। কারণ তাদের সুবেদারের সামনে হাতীর পিঠে আরোহণ করা মানেই সুবেদারকে অসন্মান করা। কিন্তু বিদ্রোহীদের

পুনঃপুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁরা হাতীর পিঠ থেকে নামতে নিমরাজি হয়। তাই তাঁদের তীর মেরে হত্যা করা হয়। মঙ্গল সাঁওতাল হেনসর বড় ছেলেকে হত্যার কথা স্বীকার করেছিল। বাবু দিগম্বর চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থ "দি সান্থাল হুল"-এ উল্লেখ করেছেন, সিধু-কানহু এই হত্যাকে সমর্থন করেননি উল্টে হত্যাকারীকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

মেজর জেনারেল লয়েডের নিয়োগ এবং নারকীয় তাণ্ডব শুরু"

সর্বশক্তি নিয়োগ করেও, সম্মিলিত বাহিনীর অভিযান চালিয়েও বিদ্রোহ দমনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি তেমন কিছুই হয়নি। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, জমিদার, নীলচাষী মুর্শিদাবাদের নবাব সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য যথাসাধ্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিলেন। দানাপুর সেনা ছাউনির কমান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল লয়েড রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্ট আক্রান্ত অঞ্চলের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু বিদ্রোহ দমনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলতে তেমন কিছুই হয়নি। বিদ্রোহ প্রশমিত হবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, উল্টে দিনের পর দিন দাবানলের আকার ধারণ করছে। এমতাবস্থায় সরকারের পক্ষে বিদ্রোহ দমনে একান্তভাবেই মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ৩০ জুলাই ১৮৫৫ বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সচিব গ্রে বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনার ডাবলিউ. এইচ. ইলিয়টকে লিখলেন :

"Major General Lloyd has been appointed to take command of the whole of the troops operating against the Santals.

General Lloyd has been directed by the Supreme Government to proceed, in the first instance, to Rajmahal. He has been informed that the president in council, considering it very desireable that prompt and speedy measures should be taken to put down the insurrection has resolved upon placing the conduct of the operation entirely in his hand ; and he has been requested to take immediate steps for dispersing and capturing the insurgents and for putting down the rebellion.

In communicating these orders to this Government, the president in council has requested that the lieutenant Governor would instruct the civil officers of the several division to communicate with the major General and to afford him every information and assistent in a carrying into effect the line of

operation he may decide upon.

In a subsequent communication, the president council has explained that it was not intendent by the above quoted instruction to General Lloyd that the military should act independently of the civil powers against our own subject but simply that the nature of the military operations necessary for dispersing and capturing the insurgents, and for putting down the rebellion, should be entirely in the hands of the military commanders. It is stated also that the civil authorities have still power to act with the civil means at their disposal and that the only charge intended to be made is in transferring the power each civil officers had over the movements of the troops to a military officer of experience ; operation necessary for quelling the insurrections the president in council consider it is added that the civil authorities should abstain from ordering out troops except in cases of sudden emergency, but that they should keep the military officer, particularly the officer in command in the district, fully informed on all points connected with the state of the country, and the movements of the rebels and offer such suggestion as may occur to them connected with the general object in view.

Since General Lloyds appointment it has also seemed desireable to the president in council to appoint Colonel Bird, with the position of a bregedier, to the special command of the troops employed in the Beerbhoom and Bancoorah districts. This officer is instructed to take immediate measured, in concert with the civil officer, for dispersing and capturing the insurgents where ever they may be, and for putting down the rebellion. He is informed that Loch at Munglepore and yourself at Soorie will afford him every informations and assistance ; and he is requested to act in concert with Mr. Loch and yourself in carrying out the line of operations necessary to suppress the insurrection :

The Lieutenant Governor has only to add to the above instruction the expression of his earnest hope that you yourself and all the civil officers subordinate to you will in every possible way, aid and promote the operations of the troops. Your attention should more particularly be directed to procuring efficient and

trustworthy guides for the troops, and to providing them with carriage and supplies, orders have some days since been issued to the magistrate of all the surrounding districts, urging them to procure as many elephants as possible, and forward them into Beerbhoom and Bhagulpore ; and some have already been sent up direct from Calcutta. Also as soon as it shall be decided at what places detachments of troops are to be posted you should see that every exertion is made to afford good shelter both for officers and men ; and especial care should be taken to provide, as early as possible ; charpoys or some elevated platforms for the sepoys to lieupon.

You should like wise, it as may be possible, the medical arrangements are not yet efficiently organised take it upon yourself to see that the officer in command of every detached body of troops is furnished with a few simply medicine particularly quinine with brief instructions as to the quantities to be given.

The Lieutenant Governors is desirous to receive reports from you of the progress of affairs as frequently as possible, you will communicate the above orders to the several officers subordinate to you who are employed in the disturbed districts."[৪৫]

W. Grey

Secretary to the Government of Bengal

অর্থাৎ, সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে যে সব বাহিনী নিযুক্ত আছে তাদের পরিচালনার জন্য মেজর জেনারেল লয়েডকে নিয়োগ করা হয়েছে।

জেনারেল লয়েডকে সরকার প্রথমেই রাজমহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে বলেছে। তাকে বলা হয়েছে, যেহেতু প্রেসিডেন্ট ইন কাউনসিল মনেপ্রাণেই চায় বিদ্রোহ দমনের জন্য দ্রুত এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সেই হেতু বিদ্রোহ দমনের যাবতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য তাঁর হাতেই সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ, হাতেনাতে গ্রেপ্তার এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

সরকারের এ সব সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ইন কাউন্সিল, লেফটেনান্ট জেনারেলকে অনুরোধ করেছে তিনি বিভিন্ন বিভাগীয় অসামরিক কর্তৃপক্ষকে মেজর জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এবং বিদ্রোহ দমনের

৪৫. তারাপদ রায় সম্পাদিত সান্থাল রিবেলিয়ন, পৃ. ১৬

সঙ্গে যুক্ত সমস্ত তথ্য এবং সহায়তা তাঁকে দিতে।

অনুরূপ আর একটি আদেশে প্রেসিডেন্ট ইন কাউন্সিল তার সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা করেছে। এই সমস্ত আদেশের মর্ম এই নয় যে লয়েড আমাদের প্রজাদের বিরুদ্ধে সাধারণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে, তাঁর ক্ষমতা কেবল বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ, গ্রেপ্তার এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তাঁর হাতে অর্পণ করা হয়েছে। সাধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অসামরিক কর্তা ব্যক্তিরই, তাঁরা কেবল বিদ্রোহ দমনের প্রয়োজনে সেনাবাহিনীকে পরিচালনার ক্ষমতাই সামরিক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রদান করবেন। প্রেসিডেন্ট ইন কাউন্সিল তার সঙ্গে এটা যোগ করার প্রয়োজন মনে করে অসামরিক কর্তাব্যক্তিরা নেহাত প্রয়োজন না হলে সামরিক বাহিনীকে কোনো নির্দেশ দেবেন না। কিন্তু এলাকায় পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নির্দিষ্ট বিন্দু এবং বিদ্রোহীদের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করবেন এবং হঠাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে তার কাছে সুপারিশ করবেন।

জেনারেল লয়েডের নিযুক্তির পরেই বাঁকুড়া এবং বীরভূমের সেনাবাহিনীকে বিশেষভাবে পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট ইন কাউন্সিলেরর কাছে কর্নেল বার্ডকে ঐ দুই জেলার বিগ্রেডিয়ার হিসেবে নিয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই অফিসারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আসামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিদ্রোহীরা যেখানেই থাকুক তাঁদের খুঁজে বার করে ছত্রভঙ্গ করুন এবং যত শীঘ্র সম্ভব গ্রেপ্তার করুন। তাঁকে এও বলা হয়েছে মাঙ্গালপুরের লক এবং সিউড়িতে আপনি তাঁকে সব রকমের তথ্য এবং সহায়তা দিবেন এবং আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই বিদ্রোহ দমনের জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

লেফটেনান্ট গভর্নর তার সঙ্গে এটা যোগ এবং কায়মনোবাক্যে কামনা করে যে, আপনি এবং আপনার অধীনস্থ কর্মচারীর কাছে আপনারা বিদ্রোহ দমনের জন্য সম্ভাব্য সব পন্থা, সাহায্য দিয়ে সেনাবাহিনীর কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করবেন। সেনাবাহিনীর চলাচলের জন্য দক্ষ এবং বিশ্বস্ত অনুচরের ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং সেগুলিকে পরিবহনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে নিকটবর্তী জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতী যোগাড় করে বীরভূম এবং ভাগলপুরে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং কলকাতা থেকে কিছু পাঠিয়েও দেওয়া হয়েছে। বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত সেনাবাহিনীকে কোথায় কোথায় নিয়োগ করা হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখবেন যাতে অফিসার এবং সাধারণ সৈনিকদের থাকার জন্য ভালো জায়গার ব্যবস্থা করা হয়। সিপাহীদের শোওয়ার জন্য চারপাই বা উঁচু স্থান বাছার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

অনুরূপ ভাবে চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যেটা এখনো হয়ে ওঠেনি সেটা যাতে হয় সেটা দেখবেন এবং প্রত্যেকটা বাহিনীর প্রধানকে নির্দিষ্ট কিছু ঔষধ বিশেষ ভাবে কুইনাইন দিয়ে তার পরিমাণ জানিয়ে দিবেন।

বিদ্রোহ দমনের অগ্রগতি সম্পর্কে যত ঘন ঘন সম্ভব লেফটেনান্টকে জানাবেন এবং আপনি আপনার সমস্ত অধীনস্থকে যারা বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে কর্মরত তাদের এই কথা জানিয়ে দেবেন।

ইতি

ডাবলিউ গ্রে

বাংলা সরকারের সচিব

মেজর জেনারেল লয়েড জুলাই মাসের শেষ দিকে ভাগলপুরে এসে পৌঁছলেন এবং ২রা আগস্ট ভাগলপুর থেকে রাজমহলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন, কিন্তু ১১ আগস্ট পুনরায় ভাগলপুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। অপরদিকে দামিনে বিদ্রোহ দমনের নাম করে রাজমহলে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর নারকীয় তাণ্ডব শুরু হল। মেজর বারোজ, শাকবার্গ, ক্যাপ্টেন শেরউইল প্রভৃতি সেনা অফিসার যারা বিদ্রোহ দমনে রাজমহলে এসেছিলেন তারা প্রত্যেকেই তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী সুনামের (কুনামের) সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। সেনাবাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ করে বিদ্রোহীরা তাঁদের কৌশল বদলালেন। তাঁরা মুখোমুখি মোকাবিলা বা সংঘর্ষের পরিবর্তে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন অর্থাৎ গেরিলা কায়দা নিলেন। বৃদ্ধ. বৃদ্ধা এবং কচি-কাচারা কুঁড়ে ঘরে ছিলেন। এই সুযোগে মেজর বারোজ. শাকবার্গের অধীনস্থ বাহিনী কুঁড়ে ঘরগুলি ভেঙ্গে ফেলতে লাগলেন, খড়ের চালে আগুন ধরিয়ে দিতে লাগলেন। অসহায়, অসমর্থদের বন্দুকের নল দিয়ে খোঁচা মেরে আধমরা করে দিয়ে আদিম উল্লাসে ফেটে পড়লেন। ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে তাঁরা তাঁদের বীরত্ব জাহির করতে লাগলেন। বেনাগাড়িয়ার ছটরায় দেশমাঝি বিদ্রোহের সময় যার বয়স ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর পরবর্তী কালে যিনি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন এবং "ছটরায় দেশমাঞ্জহিয়াঃক কাথা" নামে একখানা বই লিখেছিলেন। বইটা সাঁওতাল বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই গ্রন্থে সেনাবাহিনীর অত্যাচারের সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে তাই এখানে পেশ করছি :

After two or three days soldiers came. They looted and set fire to villages. When people heard this, there was panic and they ran here and there to save their live ; We left our houses, property and cattle and rushed to the forests. We filled

the Salbona mountain and hid in the lains of tigers. From fear of the soldiers, we lost our fear of tigers and bears. Some people took with them as much food and cattle and as many bullocks and buffallooes as they could.*

অর্থাৎ, দুই অথবা তিন দিনের মাথায় সেনাবাহিনী গ্রামে ঢুকল। ওরা এসেই গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করে জ্বালিয়ে দিতে লাগল। লোকে যখন এ কথা শুনল তখন প্রাণ বাঁচাবার জন্য এখানে ওখানে ছুটতে লাগল। আমরা আমাদের ঘরবাড়ি, গরুবাছুর এবং জমিজায়গা পেছনে ফেলে জঙ্গলে পালিয়ে গেলাম। শালবোনার জঙ্গল আমাদের লোকজনে ভর্তি হয়ে গেল। ভয়ে বাঘের গুহায় ঢুকে পড়লাম। সেনাবাহিনীর ভয়ে আমরা বাঘ ভালুকের ভয়ঙ্কর চেহারাও ভুলে গেলাম। কিছু কিছু লোক তাদের সঙ্গে যথাসম্ভব খাবার দাবার, গরু এবং মোষও নিয়ে এসেছিল।

আক্রান্ত অঞ্চলের লোকজন সেনাবাহিনীর ভয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন এবং জঙ্গলে আত্মগোপন করে রইলেন। কিন্তু শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামে ফিরে যা দেখলেন ছটরায় দেশমাঞ্ঝহির কথায় তা হল :

"A day or two later we began to flocking back. We halted here and there and begged our food. Then we reached Hasapa Thor in the evening. The whole village was burnt to ashes, but a few cowsheds remained. We stayed in a broken cowshed one or two other families had come there before us. We had nothing to eat. Then our old mother went to them that night to beg from them. But alas! They also said, 'we have nothing, mother. We also are new here and have nothing. We were dismayed. Then I remembered the bel tree which stands by the boys hostel that had been looked after by me and had grown under my care. We went in the night and gathered the bel fruits and brought them with us. Then we boiled and ate them and then only did we have relief. Hunger is a terrible thing. It is worse than illness in the body ; and that also we have known."**

অর্থাৎ, দু একদিনের মধ্যে আমরা দল বেঁধে ফিরতে লাগলাম। প্রত্যাবর্তনের যাত্রাপথে এখানে ওখানে কিছুদিন কাটিয়ে ভিক্ষে করে খাবার যোগাড় করতে শুরু করলাম। অতঃপর সন্ধ্যা নাগাদ হাসাপাথরে পৌঁছলাম। গোটা গ্রামটাই

*সূত্র : এল. এস. এস. ও ম্যালি-বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার সাঁওতাল পরগনা—পৃ. ৩৮৮

**সূত্র : এল. এস. এস. ও ম্যালি-বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার সাঁওতাল পরগনা ৩৯০. পৃষ্ঠা।

আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল, কেবলমাত্র জীর্ণ কয়েকটা গোয়ালঘর তখনো সেখানে অবশিষ্ট ছিল। সেই ভাঙ্গা গোয়ালের একটায় আমরা আশ্রয় নিলাম। কিছু কিছু পরিবার আমাদের পৌঁছবার আগেই সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। আমাদের খাবার বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আমার বৃদ্ধা মা রাত্রে তাদের কাছে গিয়ে খাবার চাইল, কিন্তু হায়! তারা মাকে বললেন তাঁদের কাছেও কিছু নাই। তাঁরাও এখানে নতুন এসেছেন সঙ্গেও কিছু নাই। আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। এমত সময়ে আমার বয়েজ হস্টেলের পাশে বেল গাছের কথা মনে পড়ল, যেটাকে আমি দেখাশোনা করেছি এবং আমার পরিচর্যা পেয়েই গাছটা বেড়ে উঠেছিল। আমরা রাত্রেই সেখানে চলে গেলাম এবং ডাঁসাবেল তুলে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। তারপরে সেগুলিকে সেদ্ধ করে খেতেই একটু আরাম মনে হল। ক্ষিদে অসুস্থ শরীর থেকেও ভয়ঙ্কর সেটাও আমরা বুঝলাম।"

বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত সেনাবাহিনী ধ্বংসের আনন্দে মেতে উঠলেন। মেজর শাকবার্গ সাঁওতালদের গ্রামে ঢুকে বহু কুঁড়ে ঘর ভেঙ্গে ফেললেন এবং কিছু সম্পত্তিও হস্তগত করলেন। বারোজ পিয়ালপুরে ঢুকে বহু সাঁওতাল গ্রাম জ্বালিয়ে খাক করে দিলেন। ক্যাপ্টেন শেরউইলও ৪০ নং রেজিমেন্টের দেশীয় পদাতিক বাহিনীর ১৫০ জন সেনাবাহিনী নিয়ে বারোখানা সাঁওতাল গ্রাম ভেঙে দিয়ে জ্বালিয়ে দিলেন। বালবান্দার দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁরা দেখতে পেলেন একখানা নীলকুঠি থেকে তখনো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। বিদ্রোহী সাঁওতালরাই সেখানে আগুন ধরিয়ে দিয়ে কেটে পড়েছিলেন। চোরার কাছাকাছি গিয়ে শের উইল একদল সশস্ত্র সাঁওতালের দেখা পেলেন। কিন্তু সেনাবাহিনীকে দেখামাত্র তারা জঙ্গলের দিকে সরে পড়লেন। তবে শেরউইল লুণ্ঠিত দ্রব্যের একটা বড় অংশ পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন এবং গণপত গোয়ালা নামে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুচরকে গ্রেপ্তার করতেও সমর্থ হন। এর পর ক্যাপ্টেন শেরউইলের অধীনস্থ বাহিনী মেজর শাকবার্গের অধীনস্থ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। উভয়ের সম্মিলিত বাহিনীর শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে মেজর জেনারেল লয়েড শাকবর্গকে রাজমহলে ডেকে পাঠালেন। মেজর শাকবার্গের অধীনস্থ বাহিনী দীঘি থেকে চার মাইল পূর্বে বিষহরার অভিমুখে যাত্রা করে। তাঁর অধীনস্থ বাহিনীর থাকার সুবন্দোবস্ত করে শাকবার্গ্ বার্ণের নেতৃত্বে ৫০ জনের একটি দলকে পার্শ্ববর্তী সাঁওতাল গ্রামগুলিতে লুটপাট ও বিধ্বস্ত করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। লেফটেনান্ট বার্ণ কিছুদূর অগ্রসর হতেই ৬০০ সাঁওতাল বিদ্রোহীর একটি দলকে দেখতে পেয়ে তাদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কিন্তু বিদ্রোহীরা বার্নের অধীনস্থ সুসজ্জিত বাহিনীর হাতে

চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও নিহত হন। মেজর শাকবার্গ দক্ষিণপূর্বে যাত্রা করে ডিডে পৌঁছলেন। সেখান থেকে উত্তর পূর্বে যাত্রা করে খোনেবায় পৌঁছে লহ্মনডির আশপাশে ১৫টি গ্রামকে ধ্বংস করে ফেললেন।

২৯ জুলাই ১৮৫৫ মেজর বারোজ পিয়ালপুরের সাড়ে ছ'মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ভুগ্গায় পৌঁছলেন। তিনি লেফটেনান্ট গউনকে ৭৫ জনের একটি দল দিয়ে পশ্চিমে অবস্থিত মুনহান ও মুনকাতরা গ্রাম দুটি ধূলিস্মাৎ করতে বললেন, একই সঙ্গে লেফটেনান্ট রুবিকে ১০০ জনের একটি দল দিয়ে ভুগ্গা, তিতেরিয়া, ভুসকদার, রাঙ্গোকিটা হুরিয়ালিয়া, কামুলডিহ এবং রোচাই সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে বললেন।

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের অনুসন্ধানে বিদ্রোহীদের পেছন পেছন জঙ্গলে ঢুকে পড়ে এবং রঘুনাথপুরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বিদ্রোহীরা চাঁদ এবং কানহুর নেতৃত্বে বীরত্ব সহকারে লড়াই করে পরাজিত হয়। এরপর ব্রিটিশ বাহিনীর লক্ষ হল বিদ্রোহীদের মূল ঘাঁটি এবং কেন্দ্রবিন্দু ভগনাডিহি বিধ্বস্ত করা। ভগনাডিহি ভস্মীভূত করার পর ব্রিটিশ বাহিনী বারহেটও বিদ্রোহীদের দখল মুক্ত করে। ব্রিটিশ বাহিনী ভগনাডিহি এবং বারহেটের বিদ্রোহ দমনে বড় রকমের সাফল্য লাভ করলেও লছিমপুর এবং দলদলি পাহাড়ের জঙ্গলে বিদ্রোহীদের এক বিরাট বাহিনী তখনও অক্ষত অবস্থায় ছিল। এমতাবস্থায় ভাগলপুরের কমিশনার ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিসের বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য একদল সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টিতে তিনি বংশী ছেড়ে যেতে পারেননি। পয়লা আগস্ট বিকেল চারটেয় চুনাকুঠি পৌঁছেই তিনি বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হন। বিদ্রোহীরা প্রচণ্ড বিক্রমে ব্রিটিশ বাহিনীর মোকাবিলা করতে লাগলেন। উপায়ান্তর না দেখে ফ্রান্সিস গুলি ছুড়ে দশজনকে হত্যা করলেন বটে কিন্তু বিদ্রোহীদের আক্রমণে নিজের বাহিনীরও দুজন সামান্য আহত হলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে তিনি লড়াই থামিয়ে নিজের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করলেন। পরদিন প্রাতে পুনরায় লড়াই এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদের আর দেখা পাননি। তাঁরা সবাই কাছাকাছি জঙ্গলে আত্মগোপন করেন। ফ্রান্সিস বিদ্রোহীদের শিবির আগুনে জ্বালিয়ে দিযে বাড়কোপ রওনা হয়ে যান। কাছাকাছি জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা বিদ্রোহীরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে ফ্রান্সিসের বাহিনীকে আক্রমণ করেন কিন্তু সফল হতে পারেনি। ইতিমধ্যে মুঙ্গের থেকে মিঃ ডাবলিউ. জে. মানি এবং ভাগলপুর থেকে আরো কিছু দেশীয় পদাতিক বাহিনী ফ্রান্সিসের দলে পাঠিয়ে ফ্রান্সিসের বাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলা হয়।

ফারকুতি

বীরভূমেও বিদ্রোহ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। বীরভূমেব হাজার হাজার সাঁওতালের সঙ্গে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরাও বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। বিদ্রোহীরা ২০ জুলাই মিহিজানপুর লুটপাট ও বিধ্বস্ত করে, অতঃপর নারায়ণপুর অভিমুখে যাত্রা করে। নারায়ণপুর লুন্ঠন করার পর বিদ্রোহীরা নারায়ণপুরের জমিদারকে নৃশংসভাবে খুন করে। তারা জমিদারের এক একটা অংশ কেটে বলেছিল, চার আনা, আট আনা এবং বারো আনা শোধ হল। অবশেষে ধড় থেকে মাথা কেটে চিৎকার করে বলেছিল ফারকুতি অর্থাৎ ষোলো আনাই শোধ হল। কিন্তু আফজলপুর থানার দারোগা গুলাম আলি খান সাহসের সঙ্গে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করেছিলেন। ২১ জুলাই কাজুরিয়ার সর্দার ঘাটোয়াল, অন্য কয়েকজন ঘাটোয়াল এবং বাঙালি মহাজনের দল কাতমা গ্রামে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অবরোধ তৈরি করে ব্যর্থ হয়। জুলাই মাসেরই ২৩ তারিখে বিদ্রোহীরা গণপুর এবং কয়েকটি গ্রাম লুঠ ও বিধ্বস্ত করে। তৎকালে গণপুর দেশীয় প্রক্রিয়ায় লৌহ-নিষ্কাশনের জন্য বিখ্যাত ছিল। গণপুরের পর বিদ্রোহীরা বীরভূমের জেলা শহর সিউড়ির ১৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত নাগোরে লুটপাট সংঘটিত করে। লেফটেনান্ট টুলামাইন এবং ৫৬তম দেশীয় পদাতিক বাহিনীর লেফটেনান্ট ডিলামাইন বিদ্রোহীদের দখল করবার জন্য এগিয়ে আসেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করবার মত ক্ষমতা লেফটেনান্টদের বাহিনীর ছিল না। বিদ্রোহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে টুলামাইন নিহত হলেন, কিন্তু ডিলামাইন বিদ্রোহীদের সেখান থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। বিদ্রোহীরা আফজলপুর, নাগোর এবং মুহুনেহা পর্বত ছেড়ে কুমড়াবাদ এর অভিমুখে যাত্রা করে।

"বিডওয়েলের নিয়োগ এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সংহতি ভাঙ্গার চেষ্টা"

বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত সেনাবাহিনীর নারকীয় তাণ্ডবে সাঁওতালদের বহু কুঁড়ে ঘর ভষ্মীভূত হল, বহু অসহায় নিরপরাধ মানুষের প্রাণ গেল কিন্তু বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলতে তেমন কিছুই দেখা গেল না। কারণ সেনাবাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ করেই বিদ্রোহীরা তাঁদের রণকৌশল পাল্টে ফেলেছিলেন, মুখোমুখি সংঘর্ষের পরিবর্তে তারা গভীর জঙ্গলে ঢুকে আত্মগোপন

করেছিলেন। সুযোগ বুঝে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অতর্কিতে আক্রমণ করতে লাগলেন। ফলে বিদ্রোহীদের একটা বড় অংশকে তখনও দমন করা সম্ভব হয় নি। এই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে ভাগলপুরের কমিশনার মিঃ এফ. ব্রাউনের সঙ্গে বাংলার সরকারের মনোমালিন্য দেখা দিল। তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এমতাবস্থায় সরকার ভাগলপুরের কমিশনারকে পাশ কাটিয়ে নদিয়া ডিভিশনের কমিশনার মিঃ এ. সি. বিডওয়েলকে বিদ্রোহ দমনের জন্য স্পেশাল কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত করে তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদ্রোহ দমন করে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে নির্দেশ দিলেন।

বাংলার সরকারের সচিব গ্রে. বিডওয়েলকে ৬ আগস্ট ১৮৫৫ রাজমহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার নির্দেশ দিলেন এবং মেজর জেনারেল লয়েডের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। বিডওয়েল বিদ্রোহ দমন করতে নেমেই প্রথমে বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলেন। কারণ খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তি এবং সংহতিকে পৃথিবীর যত বড় শক্তিই হোক ভয় পায়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশরাও এই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভয় পেয়েছিলেন তাই তাকে ভাঙবার জন্য বিডওয়েল এক বিজ্ঞপ্তি বা ঘোষণাপত্র জারি করেন।

"In as much as it appears that amongst the Santals, who have risen in rebellion against the Government plundering and devastating the country, and opposing the troops, there are many who see the folly and inequity of their proceeding & are desirous of being pardoned and resuming their former quite life, notice is here by given that the Government ever anxious for the welfare of its subjects, though led away by counsels of bad men will freely pardon all Santals who may within 10 days appear before any constituted authority (Hakim) and tender submission always excepting those, who shall be proved to have been principal instigators and leader of the insurrection, and those who shall be proved to have been pricipally concerned in the perpatation of any murder, as soon as complete submission is shown, all well grounded complaints preferred by the Santals will be fully enquired into, but on the other hand, all in surgents remaining in opposition to Government of the issue of this proclamation will be visited with the promptest and severest punishment."[৪৬]

A. C. Bidwel
Special Commissioner
V. Grey
Secy to the Govt of Bengal

৪৬. তারাপদ রায় সম্পাদিত, সান্থাল রিবেলিয়ন, পৃ. ৩০

অর্থাৎ, দেখেশুনে যা মনে হচ্ছে, সাঁওতালদের মধ্যে যারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, বাড়ীঘর লুটপাট করছে, বিধ্বস্ত করছে এবং সরকার বাহিনীকে বাধা দিচ্ছে, এদের মধ্যে অনেকেই এমন লোক আছে যারা এটাকে অন্যায় বলে মনে করে, বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করাকে মূর্খামি বলে মনে করে, নিজেদের এই সব কাজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চায়। সরকার যেহেতু তার অধীনস্থ প্রজাদের ব্যগ্রভাবে মঙ্গল কামনা করে, কিন্তু বদ লোকের পাল্লায় পড়ে বিপথগামী হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে উপদেশ এই যে, এই ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হবার দশ দিনের মধ্যে সরকার নির্ধারিত কোনো সাংবিধানিক আধিকারিকের (হাকিম) নিকট উপস্থিত হয়ে নিজের দোষ স্বীকার করে তবে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কিন্তু যারা বিদ্রোহের মূল হোতা, নেতৃস্থানীয় কিম্বা যাদের বিরুদ্ধে খুনের নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে তাদের ক্ষমা করার প্রশ্নই নেই। আত্মসমর্পণের পালা চুকে গেলেই তাদের অভিযোগ গুলির তদন্ত শুরু হবে। কিন্তু যদি কেউ আত্মসমর্পণ না করে সরকারের বিরোধীতা করে তবে তাদের মনে রাখতে হবে সরকার তাদের ছেড়ে কথা বলবে না, সরকার সাত-তাড়াতাড়ি কঠোর শাস্তি প্রদান করবে।

সেই সঙ্গে স্পেশাল কমিশনার বিডওয়েল ভাগলপুরের কমিশনারকে লিখলেন :

"I have the honour to annex extract, Paras 4 to 7 of a letter from the Secretary to the Government of Bengal to my address No. 1868 dated 6th August and to request your particular attention to the obsevation and instructions contained there in.

You will be good enough to promulgate amongst the Santal Population by ever means in your power, copies of the enclosed proclamation and the name of every submission should be entered in a book exhibition the following particulars.

(1)	(2)	(3)	(4)
Name/Fathers name	Age/Place of residence	Whether he admits having been engaged in any act of rebellion, if so the particulars	Remarks

To all who tender their submission a certificate in the accompanying form should be given and the accompanying Mochoolka should be signed by them."[৪৭]

A.C. Bidwell

Comm. of special deputation

৪৭. ঐ, পৃ. ৮

অর্থাৎ, ৬ আগস্ট বাংলার সরকার সচিবের কাছ থেকে ১৮৬৮ নম্বরওয়ালা একটা চিঠি আমার ঠিকানায় এসেছে। চিঠির ৪ থেকে ৭ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয় সমূহ আপনাকে জানাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে এই কারণে যে, চিঠিতে বিবৃত নির্দেশ এবং পর্যবেক্ষণের প্রতি আপনার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণের জন্য।

চিঠিতে আটকানো ঘোষণাপত্রটি আপনি আপনার সক্ষমতা অনুযায়ী ভালো করে এবং যথাযথ ভাবে সাঁওতালদের মধ্যে প্রচার করবেন এবং আত্মসমর্পণকারীদের নাম নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ উল্লিখিত দলিলে যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।

নাম/বাবার নাম	বয়স/ঠিকানা	বিদ্রোহী কিনা যদি বিদ্রোহী হয় তবে তার বিবরণ	মন্তব্য

যারাই আত্মসমর্পণ করবে তাদের সবাইকে আটকানো ফর্মের সঙ্গে একটা সার্টিফিকেট দেবেন এবং আত্মসমর্পণকারীকে আটকানো মুচলেকায় সই করিয়ে নেবেন।

এ, সি, বিডওয়েল
স্পেশাল ডেপুটেশন নিযুক্ত
কমিশনার

একেই কি বলে গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল। আত্মসমর্পণের কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না বিদ্রোহীদের কাছ থেকে কিন্তু ফর্ম রেডি হয়ে আছে।

আমি আলোচনার শুরুতেই বলে নিয়েছি আবার বলছি এই সব ঘোষণার পেছনে সরকারের আসল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা কারণ ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে সবাই ভয় পায়। কিন্তু সরকারের সেই আশা পূরণ হয় নি। বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণের জন্য কেউ এগিয়েও আসেনি। উল্টে ঘোষণাপত্রকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তার গায়ে থুতু দিয়ে রাস্তার পাশে আস্তা কুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার লিখছেন :

"A proclamation was therefore issued, offering pardon to all except the leaders."

"And the proclamation of pardoned was received with loud defance and contempt."[৪৮]

অর্থাৎ, "বিদ্রোহের নেতা ব্যতিরেকে সবাইকে ক্ষমা করবার ঘোষণাপত্র জারি হল।

৪৮. ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার, দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল, পৃ. ১৭১/১৭২

কিন্তু বিদ্রোহীদের ক্ষমা করবার ঘোষণাপত্রটিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা হল।"

ক্ষমা করবার সরকারি ঘোষণাকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করবার পর বিদ্রোহীবা সাময়িক অস্ত্রবিরতি দিলেন। তাই দেখে বীরভূমের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটরাও কমিশনারকে লিখলেন :

"All has been quiet." The villagers have returned to their homes, and the husbandmen engaged in the cultivation of their land as usual. The Santals are nowhere to be found...having retreated to a place some thirty miles off, in another districts."[৪৯]

অর্থাৎ, "সব কিছুই শান্ত। গ্রামবাসীরা নিজ নিজ বাড়ীতে চলে গেছে, চাষীরাও নিজের নিজের জমিতে রোজকার মত কৃষি কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। সাঁওতালদেরও কোথাও দেখা যাচ্ছে না...তারা ৩০ মাইল দূরে অন্য জেলায় চলে গেছে।

সাময়িক অস্ত্রবিরতিকে কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের পরাজয় বলে ধরে নিয়েছিলেন কিন্তু তাঁদের সেই ধারণা যে কত ভ্রান্ত তা অচিরেই প্রমাণিত হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা সাময়িক অস্ত্রবিরতির পর বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫ বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের কমিশনারকে লিখছেন :

"During past fortnight, upwards of thirty villages have been plundered and burned by the insurgents in thannahs operbundah (operbandhah) and Nangoolea (Langulia) the whole of the country from Lorojore, four milles West of Nuggur (Nagore), to within a short distance of Deoghar, is in their hands. The Dawks (mails) are stopped, and the inhabitants deserted their villages and fled. They are divided into two large bodies. One encamped at Raksadangal, ten miles north of the operbandah thannah in Zillah Bhagalpore and the other at Teelaboonie, six miles west of Soory, and also in Bhagalpore, but on the confines of thannah Nangoolea (Langulia) ; and their numbers average, as nearly as we can as certain, from 12,000 to 14,000 and are receiving augmantation from all quarters."[৫০]

অর্থাৎ, "বিগত এক পক্ষকালের মধ্যে ওপরবাঁধ ও লাঙ্গুলিয়ার মধ্যবর্তী ৩০টি গ্রামকে বিদ্রোহীরা লুঠ করে জ্বালিয়ে দিয়েছে। নুগুরের (নাগোর) চার

৪৯. ডাবলিউ, ডাবলিউ, হান্টার, দি অ্যানালগ অব রুবাল্ বেঙ্গল, পৃ ১৭১/১৭২।
৫০. তারাপদ রায় সম্পাদিত, সান্থাল রিবেলিয়ন পৃ. ৪১।

মাইল পশ্চিমে অবস্থিত লারজোর থেকে দেওঘরের একেবারেই কাছাকাছি বিদ্রোহীদের দখলে চলে গেছে। ডাকব্যবস্থা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে সবাই পালিয়ে গেছে। বিদ্রোহীরা দুটো বড় দলে বিভক্ত হয়ে আছে। একদল ভাগলপুর জেলা ওপরবাঁধ থানার দশ মাইল উত্তরে রক্ষাদঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছে, অন্যদল সিউড়ি এবং ভাগলপুরের ৬ মাইল পশ্চিমে তিলাবনিয় অপেক্ষা করছে। লাঙ্গুলিয়া থানা এলাকায় বিদ্রোহীর সংখ্যায় বারো থেকে চৌদ্দ হাজারের মত হবে, তবে বিভিন্ন জায়গা থেকে বিদ্রোহীদের দল এসে এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সংখ্যা ক্রমশ বাড়িয়ে দিচ্ছে।"

রক্ষাদঙ্গলের ৩,০০০ বিদ্রোহীর একটা দল মোচিয়া কাঁসজোলা, রামা এবং সুন্দ্রা মাঝির নেতৃত্বে ১৭ সেপ্টেম্বরের বিকেলে ওপরবাঁধের কাছাকাছি ঘাঁটি গাড়ে এবং পরদিন স্থানীয় থানা এবং গ্রাম লুট করে জ্বালিয়ে দেয়। থানার দারোগা এবং বরকন্দাজরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানে ছিলেন কিন্তু যখন দেখলেন বিদ্রোহীদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলা অসম্ভব তখন তারা রণে ভঙ্গ দিলেন। দারোগা বিদ্রোহীদের মতলব আগাম অনুমান করে অফিসিয়াল রেকর্ডগুলি পূর্বেই থানা থেকে দেওঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বহু কষ্টে সানা এবং আফজলপুর হয়ে সেখানে পৌঁছলেন এবং কমান্ডিং অফিসারকে সেনা পাঠাতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কমান্ডিং অফিসার দূরত্ব এবং জঙ্গলের অজুহাত দেখিযে সাহায্য দানে অসম্মত হলেন। কিন্তু তিনি মিঃ ওয়ার্ডকে পরিস্থিতি সবিস্তারে অবহিত করার পর রাণীগঞ্জ থেকে জামতাড়া থানা এবং সানা থেকে ওপরবাঁধ এবং আফজলপুরে সেনাবাহিনীর একটা দলকে পাঠাতে রাজী হলেন এবং বললেন বর্ষাকাল শেষ না হওয়া অবধি বিদ্রোহীদের ঠেকিয়ে রাখাব উদ্দেশ্যে বাহিনী সেখানে মোতায়েন থাকবে। পরবর্তীকালে মিলিটারি যখন বিদ্রোহ দমনে এসে পৌঁছবে তখন সেনাবাহিনীকে তুলে নেওয়া হবে।

সুলিয়া ঠাকুর, সিরু মাঝির, অধীনস্থ ৫ থেকে ৭ হাজার বিদ্রোহীদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিদ্রোহীদের শক্তিবৃদ্ধি করেন। তারা তাদের চারপাশে মাটির প্রাচীর এবং খাল কেটে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো নিশ্ছিদ্র করেছিলেন। শোনা যায় সেদিন সাঁওতাল বিদ্রোহীরা ধূমধাম করে নাকি দুর্গাপূজাও করেছিলেন। দুর্গোৎসবের জন্য থানা নাঙ্গুলিয়ার অন্তর্গত লুণ্ঠিত একটি গ্রাম থেকে দুজন ব্রাহ্মণকেও ধরে নিয়ে এসেছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতালরা ছাড়াও অনেক নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরাও যোগ দিয়েছিলেন অর্থাৎ বিদ্রোহে সাম্প্রদায়িক ঐক্যও গড়ে উঠেছিল। সেই সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং সংহতিকে সুদৃঢ় করতেই বিদ্রোহীরা

দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিলেন, সেইসঙ্গে শুভ শক্তিব জয় এবং অশুভ শক্তির পরাজয় কামনা করেছিলেন।

বিদ্রোহীরা এরপর রক্ষাদঙ্গলের বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন: রক্ষাদঙ্গলের বাহিনী এসে যোগ দিলেই তারা সিউড়ি আক্রমণের পরিকল্পনা করেছিলেন। দেওঘর থেকে সড়কপথে একজন ডাকহরকরা ডাক নিয়ে সিউড়ি যাচ্ছিলেন। বিদ্রোহীরা তাঁর ডাক কেড়ে নিয়ে তাঁকে তিনটি পাতাওয়ালা একখণ্ড শাল কাঠের ডাল দিয়ে সিউড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সাঁওতালি ভাষায় তাকে ঢারওয়াঃক বা মিসিভ বলে। তিনটি পাতার অর্থ তিনদিন পর বিদ্রোহীরা সিউড়ি আক্রমণ করতে আসছে। কিন্তু আমার মনে হয় বর্তমান অবস্থায় সিউড়ি আক্রমণ করার সাহস হবে না, তাহলেও সিউড়ির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বাড়িয়ে দেওয়া হল। কর্তৃপক্ষ বাসিন্দাদের অযথা আশঙ্কাকে দূর করতে সচেষ্ট হলেন।

জগদীশপুরের অধিবাসী ফাগু মাঝির সন্তান দারু মাঝি বীরভূমের অন্তর্গত থানা লাঙ্গুলিয়ায় বাঁশকুলি গ্রাম আক্রমণ করে লুটপাট এবং বিধ্বস্ত করেন। পিতম্বর মণ্ডল নামে একজনকে আঘাত করে আহত করেন।

ভাগলপুর জেলার দুমকা সাব ডিভিশনের অন্তর্গত অম্বা হর্না মৌজার টাপ্পা বেলপাট্টায় সিধু, কানহু, চাঁদ এবং ভৈরব ২০০ জন সাঁওতাল বিদ্রোহীকে নিয়ে লুটপাট সংঘটিত করেন এবং তিনজন বাঙালিকে খুন করেন। এ ছাড়া তারা নোসিহাট, জয়পুর, কেন্দ্রা এবং ভাগলপুরের অন্য কয়েকটি জায়গায় বিদ্রোহ সংঘটিত করেন।

বিদ্রোহ দমনের জন্য সরকার সেদিন সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহীদের ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সামরিক শক্তির বাধার সামনে পড়ে বিদ্রোহীরা দুর্বার হয়ে উঠেছিলেন। এ কথা উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়।

"মার্শাল ল জারি"

বিদ্রোহ দমনে সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করে। নদীয়ার কমিশনার এ. সি. বিডওয়েলকে বিদ্রোহ দমনে স্পেশাল কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করে এবং দানাপুব সেনা ছাউনির কমাণ্ডিং অফিসার বিগ্রেডিয়ার মেজর জেনারেল লয়েডের হাতে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করে। বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত সেনাবাহিনী সম্মিলিত ভাবে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ সংঘটিত করে কিন্তু তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেনি। বিদ্রোহ শুরু হবার পর থেকে প্রায় ৬

মাস গোটা এলাকাটাই কার্যত বিদ্রোহীদের দখলে চলে যায়। ডাক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, রেললাইন পাতার কাজ লাটে উঠে যায়। এক কথায় সরকারি বেসরকারি সব রকমের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মেজর বারোজ, শাকবার্গ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট টুগুড, ক্যাপ্টেন শেরউইল, রুবি, মেজর ভিনসেন্ট জার্ভিস সামান্য কিছু সাফল্য লাভ করলেও বিদ্রোহীরা অধিকাংশই তখনও ভীষণভাবে সক্রিয়। এমতাবস্থায় বেঙ্গল গর্ভনমেন্ট ১০ নভেম্বর ১৮৫৫ সমগ্র এলাকায় "মার্শাল ল" জারির বিজ্ঞপ্তি দিলেন :

"It is hereby, proclaimed and notified that the Lieutenant Governor of Bengal, in the exercise of the authority given to him by regulation X of 1804, and with the assent and concurrence of the president in council, does hereby established Martial Law in the following district of Bhagalpur as lies on the right bank of the Ganges. So much of the district of Murshidabad as lies on the right bank of the river Bhagirathi, the district of Birbhum. And the Said Lieutenant Governor does also suspend the function of the ordinary criminal courts of Judicature with in the district above described with respect to all person, Santals and others, owing allegiance to the British Government in consequence of their having been born or residents within its territories and under its protection, who after the date of this proclamation and within the districts above described, shall be taken in arms in open hostality to the said Government or shall be taken in the act of opposing by force of arms the authority of the same, or shall be taken in the actual commission of any over act of rebellion against the state.

"And that the same Lieutenant Governor does also hereby direct the all persons Santal and others owing allegiance to the British Government who, after the date of his proclamation shall be taken as aforesaid, shall be tried by court martial ; and it is hereby notified that any person convicted of any of the said crimes by the sentence of such court will be liable under 3, regulation X of 1804 to the immediate punishment of death."[৫১]

অর্থাৎ, "এতদ্বারা, বাংলার সরকারের লেফটেনান্ট গর্ভনরকে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১০ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এবং 'প্রেসিডেন্ট ইন কাউন্সিল'-এর সম্মতি

৫১. কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনকারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭, পৃ. ৬৩।

এবং যুগ্মভাবে ভাগলপুরের গঙ্গার দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত অঞ্চল, মুর্শিদাবাদের ভাগীরথা নদীর দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত অঞ্চল এবং বীরভূম জেলায় লেফটেনান্ট গভর্ণর 'সামরিক আইন' জারির ঘোষণা এবং বিজ্ঞপ্তি জারি করছেন।

উপরে বর্ণিত অঞ্চলের সাঁওতাল এবং অন্য সম্প্রদায়ের যে কেউ যিনি জন্ম অথবা তার অধীনস্থ অঞ্চলে বসবাস এবং সরকার প্রদত্ত প্রতিরক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে, তাদের সকলকেই এই বিজ্ঞপ্তি জারি হবার পর অস্ত্র হাতে প্রকাশ্যে সরকারের শত্রুতা অথবা জোর করে সরকারের কর্তৃত্বের বিরোধীতা অথবা বিদ্রোহ করে তবে তা রাষ্ট্রদ্রোহীতা বলে গণ্য হবে। উপরোক্ত অঞ্চলের সাধারণ ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা উক্ত লেফটেনান্ট উক্ত ক্ষমতার দ্বারা বাতিল করছেন।

উক্ত লেফটেনান্ট গভর্নর আরও নির্দেশ জারি করছেন, সাঁওতাল অথবা অন্য সম্প্রদায়ের যারা সরকারের অনুগত বিজ্ঞপ্তি জারি হবার পরে যদি উপরোক্ত অবস্থায় ধরা পড়ে তবে তার কোর্ট মার্শাল হবে এবং যার উপরোক্ত অপরাধে কোর্ট মার্শাল হয়েছে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১০ নং ধারার ৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তার মৃত্যুদণ্ড হবে।"

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ নভেম্বর সামরিক আইন জারি হল। এই সামরিক আইনের আওতাভুক্ত এলাকাগুলি হল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ভাগলপুর জেলার অংশবিশেষ, ভাগরথী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলার অংশবিশেষ এবং বীরভূম জেলা। এই এলাকাগুলি পুরোপুরি সামরিক বাহিনীর হাতে চলে যায়। সামরিক আইন জারি হবার ফলে বিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনী ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত বিদ্রোহীদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু বিদ্রোহীরা সেনাবাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে আত্মসমপণের পরিবর্তে দুর্বার হয়ে উঠলেন। পরাধীনতার পরিবর্তে লড়াই এর ময়দানে বীরের মত প্রাণ বিসর্জন দেওয়াকেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করলেন। সেদিনের কথা স্মরণ করে বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত মেজর ভিনসেন্ট জারভিস তাঁর রোজনামচায় লিখলেন :—

"It was not war, the commanding officer went on to say; they did not understand yielding. As long as their national drums beat, the whole Party would stand, and allow themselves to be shot down. Their arrows often killed our men, and so we had to fire on them as long as they stood. When their drum ceased, they would move out for about a quarter of a mile; then their drums began again; and they calmly stood till we came up and poured a few volleys into them. There was not

a sepoy in the war who did not feel ashamed of himself. The prisoners were for the most part wounded men. They upbraided us with fighting against them. They always said it was with the Bengalis, they were at war, not with the English. If a single Englishman had been sent to them who understood their wrongs, and would have redressed them, they declared there would have been no war. It was not true that they used poisoned arrows. They were the most truthful set of men I ever met; brave to infatuation. A lieutenant of mine had once to shoot down seventy five men before their drums ceased, and the party fell back."[৫২]

অর্থাৎ, "কমান্ডিং অফিসার বলে চলেছেন, না, এটা কোনো যুদ্ধই নয়। আত্মসমর্পণ কাকে বলে তারা জানে না। যতক্ষণ তাদের জাতীয় বাদ্য নাগড়ার আওয়াজ শোনা যেত ততক্ষণ দলের সবাই দাঁড়িয়ে থাকত এবং আমাদের গুলি করবার সুযোগ করে দিত। তাদের তীর আমাদের বাহিনীর খুচরো দু-একজনকে মারত বটে তাই আমরা তাদের যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত গুলি করতাম। যখন তাদের নাগড়ার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেত তখন তারা সিকি মাইল দূরে সরে যেত; তারপর যখনই তাদের নাগড়ার আওয়াজ শুরু হত তারা পুনরায় শান্ত-ধীর-স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে পড়ত এবং আমরা আমাদের বন্দুক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বৃষ্টি করতাম। আমাদের দলে এমন সিপাহী কেউ ছিল না যার লজ্জা করেনি। কয়েদীরাই সব থেকে বেশি আহত হয়েছিল। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ওরা আমাদের ভর্ৎসনা করে বলত আমাদের লড়াই তো বাঙালি মহাজনদের বিরুদ্ধে, তোমাদের সঙ্গে তো আমাদের বিবাদ কিছুই নেই। যদি কোনো একজন ইংরেজকে তাদের কাছে পাঠানো হত, যে তাদের অসুবিধা বুঝতে পারত এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করত তাহলে যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন হত না। তারা বিষাক্ত তীর ব্যবহার করেছিল, ওই কথা সত্যি নয়। তারা ছিল আমার দেখা বিশ্বাসভাজনদের অন্যতম, তাদের সাহসিকতা তারিফ করার মত। আমার একজন লেফটেনান্ট তাদের নাগড়ার আওয়াজ বন্ধ হবার আগেই ৭৫জনকে গুলি করে মেরে ফেলার পরেই তারাই পিছিয়ে এসেছিল।"

সামরিক বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে বিদ্রোহীরা দুর্বার হয়ে উঠেছিলেন। বিদ্রোহীদের সামনে পালাবার পথ খোলাই ছিল কিন্তু তারা পালিয়ে আত্মরক্ষা

৫২, ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার, দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল পৃ—১৭০

করে নি। আত্মসমর্পণ দূরের কথা লড়াই এর ময়দানে বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত তাণ্ডবের সামনে কতক্ষণ আর স্থির থাকা যায়? তাই বিদ্রোহীরা সাময়িক পিছু হটতে বাধ্য হয়। সামরিক বাহিনীর বর্বরোচিত তাণ্ডবের মুখে পড়ে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর বিদ্রোহীদের বিদ্রোহে কিছুটা ভাঁটা পড়ে যায়। তাই ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩ জানুয়ারি সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হয়। অপরদিকে সামরিক আইন প্রত্যাহৃত হবার পর থেকেই পুনরায় গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। জয়পুরের পার্শ্ববর্তী এবং মুঙ্গের জেলার সীমান্তে শৈব শার নেতৃত্বে ৩ জানুয়ারির এক পক্ষকালের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হয়। কিন্তু বিদ্রোহীরা এখন তাদের রণকৌশল পালটালেন—লুটপাট এবং খুন জখমের পরিবর্তে ইউরোপীয়ান নীল কুঠির মালিকদের চিঠি লিখে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বললেন। পাকুড়ের নিকটবর্তী সংগ্রামপুরের নীল কুঠিয়াল গ্রান্ট সাহেবকে ১২ এবং ১৩ জানুয়ারি চিঠি লিখে কুঠি আক্রমণের সংবাদ দিলেন। দীঘি থানার দারোগা সাম্থাল পরগনার অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার মিঃ ডাবলিউ. সি. টাইলর যখন তিন পাহাড়ের কাছাকাছি শ্রীকুণ্ডে ছিলেন তখন লিখলেন যে, তিনি প্রায় ছয় থেকে সাত হাজার সশস্ত্র সাঁওতালকে বীরজিত পরগনাইত এবং ছোর টিরি নাজিরের অধীনে সরলা পাহাড়ে জমায়েত হতে দেখেছেন। তিনি আরও লিখেছেন সুপারিনটেন্ডট মিঃ পন্টেটের একজন পেয়াদা বারহেটের নিকটবর্তী বারোমাসিয়ায় খাজনা আদায় করতে গেলে ২৫জন সশস্ত্র সাঁওতাল খাজনা আদায়ে বাধা দেয়। তাদের পরনে ছিল লাল শালু, মাথায় পাগড়ি এবং সাদা লম্বা ধুতির লুঙ্গি। তাদের বক্তব্য ছিল সরকার চলতি বছরের জন্য খাজনা মাফ করে দিয়েছে, অতএব মানে, মানে কেটে পড়, ফের যদি খাজনার কথা বল তবে মাটিতে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব। দাঘি থানার দারোগা টাইলরকে অবিলম্বে সামরিক সহায়তার কথা বললেন। টাইলর বারহেটে অবস্থানরত ৪২নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীর মেজর গাউসেনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে রওনা হতে অনুরোধ করলেন। গোলমালের খবর পন্টেটের কাছে পৌছলে তিনি গোলমালের খবর অস্বীকার করলেন বটে কিন্তু তাহলেও একজন সুবেদার, দুজন হাবিলদার, দুজন নায়েক এবং পঞ্চাশজন সিপাহীকে নিয়ে বোরিও অভিমুখে যাত্রা করলেন ঘটনার সত্য মিথ্যা যাচাই করে দেখবার জন্য। ঘটনাস্থলে পৌছে তিনি বিদ্রোহীদের কাউকেই দেখতে পাননি, তবে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে টাইলরকে মেজর গাউসেনের অধীনস্থ সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করে রাখতে বলে বারহেটের গাউসেনের অধীনস্থ বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য নিজের অধীনস্থ বাহিনীকেও বোরিওয় রেখে দিলেন । সাঁওতাল পরগণার অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার মিঃ টাইলর দুমকার

ডেপুটি কমিশনারকে রেলের সুরক্ষার জন্য ১০০ জনের একটা দলকে শ্রীকুণ্ডের আট মাইল উত্তরে সীতা পাহাড়ে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। লেফটেনান্ট ক্যাম্পবেলও ৪০জনকে রেলের সুরক্ষার জন্য নিয়োগ করেন। একইসঙ্গে সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত সমস্ত অঞ্চলে বেআইনি অস্ত্র রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করে দিলেন।

ছোটনাগপুরের মুখ্য সহায়ক কমিশনার ক্যাপ্টেন ই. সিসমোর ১৮৫৬ (1856) খ্রীস্টাব্দের ২ মার্চ বাংলার সরকার বাহাদুরকে লিখলেন যে, সশস্ত্র সাঁওতালদের একটা বিরাট বাহিনী কুরুকডিহা পরগণায় ঘোরাফেরা করছে। তারা শ্রীরামপুরের বিভিন্ন মহাজনের বাড়িতে আক্রমণও সংঘটিত করছে। বিদ্রোহ দমনের জন্য পুলিশ বাহিনী যথেষ্ট না হওয়ায় তিনি ৩৭নং দেশীয় পদাতিক বাহিনীকে করুকডিহা পরগণা সুরক্ষার জন্য দায়িত্ব অর্পণ করেন। লেফটেনান্ট গভর্ণর ক্যাপ্টেন ই. সিসমোরকে বাঁকুড়া এবং বীরভূমের জন্য নিযুক্ত বাহিনীর কমান্ডার এল. এস. বার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। ক্যাপ্টেন ই. সিসমোরের কথামত সেনাবাহিনী পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু যখন দেখা গেল বিক্ষোভ স্থিমিত হয়ে আসছে তখন সেই প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা হয়।

কুঁজরায়, সর্দার ঘাটোয়াল জামতাড়ার উত্তর পূর্বে ওপরবাঁধে অন্য কয়েকজন নেতার সঙ্গে কানহু-কেও গ্রেপ্তার করে। সিধুকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শোনা যায় সিধুকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সেনারা গুলি করে হত্যা করেছিল, কানহুকেও প্রকাশ্য দিবালোকে ফাঁসি দিয়েছিল। তবে তাদের মৃত্যু নিয়ে লেখকদের মধ্যে মতভেদ আছে। 'হড়করেন মারে হাপড়ামক রেয়াঃক কাথার' বক্তা জুগিয়া হাড়ামের মতে, সিধু লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। অপর দিকে 'দি হিস্টরি অব এন ইন্ডিয়ান আপল্যান্ড'-এর লেখক এফ. বি. বার্ডলি বার্টের মতে সংক্ষিপ্ত বিচারের পরে সিধুর ফাঁসি হয়। কিন্তু ছটরায় দেশ মানঝির মতে সিধু এবং কানহু উভয়েরই ফাঁসি হয়েছিল।

কানহুর ফাঁসি নিয়ে মতভেদ নেই। কিন্তু সিধুর মৃত্যু নিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের রচয়িতাদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বলেন সিধু সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছিলেন। কিন্তু হুলের রচয়িতা অরুণ চৌধুরী দিগম্বর চক্রবর্তীর উদাহরণ দিয়ে উল্লেখ করেছেন, বেইমানদের চক্রান্তে সিধু বন্দী হন। উরমার মাঝিয়া মাঝি, জমিকাদয়ার সুমা পরগনাইত প্রমুখ কয়েকজন মোড়ল সিধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখেন সিধু হাঁড়িয়া খেয়ে বেহুঁশ হয়ে আছেন। এই বেইমানরা সেই সুযোগে সিধুকে কব্জা করে মেজর জারভিসের হাতে তুলে দেয়। মেজর জারভিস তখন

ঘাঁটিয়ারিতে ঘাঁটি গেড়ে অপেক্ষা করছিলেন। এই বেইমানি বিদ্রোহীদের বিক্ষুব্ধ করে তুলল। তাঁরা বিশ্বাসঘাতকদের উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য সংঘবদ্ধ হলেন। সাতবঙ্ক্ষ গ্রামের কয়েকটা সাঁওতাল ছেলের নেতৃত্বে কয়েকজন বিদ্রোহী ওইসব বিশ্বাসঘাতকদের কয়েকজনের মুণ্ডুচ্ছেদ করে বেইমানির প্রতিশোধ নিলেন। এই ঘটনায় বিদ্রোহীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জনৈক ভগন মাঝির ছেলে জটা ও তার শ্বশুর বীরসিং একযোগে বেইমানদের অন্যতম বৈজনাথকে বেইমানির বদলা নিতে খুঁজতে লাগলেন। অন্যদিকে একদল আবার তাকে সমর্থন করল, ফলে তাদের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

ইংরেজ সেনাবাহিনীর কর্তাব্যক্তিরা সিধুকে তার নিজের গ্রাম ভগনাডিহিতে এনে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিল। ভগনাডিহি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করা হল। বহরমপুর থেকে আসা দেশীয় পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে বারহেট বাজার বিদ্রোহীদের কবল থেকে মুক্ত করা হল। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক টুগুডই সিধুকে গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়েছিলেন বলে জানা যায়।

সেনাবাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ্য করে বিদ্রোহীরা তাদের কৌশল পরিবর্তন করে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। সুযোগ বুঝে গেরিলা কায়দায় ব্রিটিশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে। এরকমই কোন এক সংঘর্ষে সিধু আহত হয়ে ডমন মাঝির সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সরকার তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্যে মোটা অংকের পুরস্কার ঘোষণা করে। একথা 'সিধু-কানহু সান্তাড় হুল'-এর রচয়িতা পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমুও উল্লেখ করেছেন। রুকনি এবং টুকনি নামে দুজন সাঁওতাল যুবতীকে সাহেবরা অপহরণ করেছিলেন। সাহেবদের হত্যা করে বিদ্রোহীরা তাদের মুক্ত করে। সেই থেকে তাঁরা সক্রিয়ভাবে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা পুরুষের বেশে গোয়েন্দাগিরি করত। সেনাবাহিনীর কানেও সেই খবর পৌঁছে গিয়েছিল। সংঘর্ষে আহত হবার পর থেকে রুকনি সিধুর পরিচর্যায় নিযুক্ত হন। সিধু কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠবার পর রুকনি সিধুকে ডমন মাঝির তত্ত্বাবধানে রেখে বাইরে গিয়েছিলেন। এই সুযোগে সেনাবাহিনীর কর্তা ব্যক্তিরা ঘাসি সম্প্রদায়ের এক মেয়েকে রুকনি সাজিয়ে খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ে এসে উপস্থিত হয় এবং আহত সিধুকে গ্রেপ্তার করে তাঁর নিজের গ্রাম ভগনাডিহিতে নিয়ে আসে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে সবার সামনে তাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়।

এ প্রসঙ্গে 'Tribal revolts'-এর লেখক ভি. রাঘবাইয়ার উক্তি বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"সাঁওতাল বিদ্রোহের মত স্বাধীনতার মহান বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়েছিল। উভয়

বিদ্রোহেই শত্রু ছিল অভিন্ন, উভয় বিদ্রোহই ছিল অসম শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বাসঘাতকতা ছিল, ছিল দলত্যাগী এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের মত মহাবিদ্রোহের মূল নায়কদেরও ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ দিতে হয়েছিল।" সে যাই হোক, তাঁদের মৃত্যুর পর বিদ্রোহীরা নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘকাল অভুক্ত থাকার ফলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন; তাই বিদ্রোহীদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে এবং বিদ্রোহের আগুন ক্রমে ক্রমে নির্বাপিত হয়।

মূল্যায়ন

অবশেষে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের দাবীব কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। সাঁওতাল অধ্যুষিত এক বিরাট অঞ্চলকে ভাগলপুর থেকে আলাদা করে "সাঁওতাল পরগণা" নামে পৃথক এক জেলার সৃষ্টি হয় এবং তাকে নন রেগুলেটেড (Non regulated) জেলা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এখানে মহাজনদের প্রবেশ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এই নবগঠিত জেলার শাসনভার অর্পণ করা হয় ভাগলপুরের কমিশনারের অধীনস্থ একজন ডেপুটি কমিশনারের হাতে। তাঁকে সাহায্য করার জন্য চারজন অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার সাঁওতাল পরগণায় নিয়োগ করা হয়। অ্যাসলি ইডেন হলেন তার প্রথম ডেপুটি কমিশনার। তাঁর নির্দেশে অত্যাচারী সেনাবাহিনীকে হটিয়ে গ্রামের শাসনভার ন্যস্ত করা হয় মাঝি, পরগনাইতদের উপরে। কিন্তু ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের গুরুত্ব, সার্থকতা কি এখানেই শেষ? মোটেই না। তার গুরুত্বকে আরো গভীরে খুঁজতে হবে। দানবীয়, নারকীয় তাণ্ডব বাহিনীর কাছে সাঁওতালরা সেদিন হার মানতে বাধ্য হয়েছিলেন একথা সত্য, কিন্তু দাম্ভিক, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ কি চিরকালের জন্য ভারতবর্ষে থেকে যাওয়ার ভিসা পেয়েছিলেন? এক কথায় তার উত্তর হচ্ছে না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ-হিন্দ-বাহিনী, বিভিন্ন জায়গায় যুগান্তর, অনুশীলন সমিতির মত গুপ্ত সমিতি ব্রিটিশ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করতে সমর্থ হলেও মূলতঃ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস গণআন্দোলনের চাপে পড়েই ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে চলে যেতে হয়েছিল। এটা কথার কথা নয়, বাস্তব ঘটনা। আমি দাবী করছি না যে, মহাত্মা গান্ধী সাঁওতালদের কাছ থেকেই এই রণকৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু ঘটনা এই যে, সাঁওতালরাই এটার সূচনা করে গিয়েছিলেন ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে তার সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন এবং

তারপরেই বুর্জোয়ারা তাঁকে তাঁদের একমাত্র নেতা হিসাবে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কোনও কোনও লেখক ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে সাঁওতালদের লড়াইকে অসম যুদ্ধ বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন কিসের ভিত্তিতে তাঁরা সাঁওতালদের এই মহান সংগ্রামকে বা বিদ্রোহকে অসম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন? সিধু-কানহু কি সামন্ত রাজা? ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈ, নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপি না কি দাক্ষিণাত্যের হায়দার আলি, টিপু সুলতান অথবা পাঞ্জাবের রঞ্জিত সিংহ? না, এর কোনটাই তাঁরা ছিলেন না, তাঁরা কোনো সামন্ত রাজা ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন আমার আপনার মতই সাধারণ মানুষ। খেটে খাওয়া। মেহনতি মানুষ। জমিদার, জোতদার, মহাজন, আমলা, পুলিশ বাহিনীর সীমাহীন শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁরা সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন এবং এই আন্দোলন সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে কোথাও কোথাও পুলিশ-সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে, এমন যেমন হয় সেই রকম। কিন্তু তাকে যুদ্ধ আখ্যা দেওয়া যায় না।

ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। সে যুগে মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করার সহজতম উপায় ছিল ধর্মের নাম নেওয়া। সিপাই বিদ্রোহে এনফিল্ড রাইফেলের বুলেট নিয়ে সেই ধর্মের আশ্রয়ই নেওয়া হয়েছিল। একথা আজ প্রমাণিত সত্য যে দুনিয়ার যত বড় শক্তিই হোক দরিদ্র, মেহনতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভয় পায়। ব্রিটিশরাও সেদিন ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে দেখে স্বাভাবিকভাবেই ভয় পেয়েছিলেন। তাই ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভাঙ্গতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তারা প্রথমে মানুষকে প্রলোভন দেখালেন যে, যারাই বিদ্রোহীদের ধরিয়ে দিতে পারবে তাদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে।

The Proclamation offered "Large rewards for the rewards for the apprehension of the insurgent Chiefs" for the Principal Chief Rs.10,000, for each of the Dewan (supposed to be about 3 or 4 in number) Rs.5,000, and for each of the minor Chiefs of pergunnuhs Rs.1,000".[৫৩]

অর্থাৎ, "বিদ্রোহের নায়কদের ধরিয়ে দিতে পারলে মোটা আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল। বিদ্রোহর প্রধান নায়কের জন্য ১০,০০০ টাকা, দেওয়ানের (সংখ্যায় তারা ৪ অথবা ৫ হবে) ক্ষেত্রে ৫,০০০ এবং পরগণার প্রত্যেক ছোট নায়কদের ক্ষেত্রে ১,০০০ টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে।"

৫৩, কে. কে. দত্ত, দি সাম্থাল ইনসারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭, পৃ—২৯

অবশেষে ঘোষণা করা হল Ring leadeɪs অর্থাৎ মূলনায়ক অথবা যাদের ক্ষেত্রে খুনের নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে তাদের বাদ দিয়ে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী অন্যদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে। (এ প্রসঙ্গে পূর্বেই বিস্তাবিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন) কিন্তু সাধারণ মানুষ সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি। বরং উল্টে তাকে ঘৃণা সহকারে প্রত্যাখান করেছিল।

স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ সরকার তার সমর্থক শ্রেণী তৈরীর উদ্দেশ্যে সাঁওতাল পরগণাকে মিশনারীদের কাছে উন্মুক্ত করে দিযেছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কালীকিংকর দত্ত লিখছেন :—

"One of the important results of the Santal insurrection was missionary activitites to the aboriginal races in preference to the civilised people of the plains and towns of Bengal and Bihar. From this time, Chotnagpur, and the adjoining hill districts of Bengal became studded with missions. The political aspect of this work is that rude tribes have been taught the value of British contact and civilisation, and together with the policy of favourable and special treatment of aborigines and converted Christian aborigines, this made aboriginal discontent a very remote posslbility. It is interesting to note that Indian reforming sects, as also orthodox Hindus and Muslims, have now applied the instrument of conversion to the aborigines, following the example of the Europeans, the result being a continuous absorption of the aborgines into Aryan Speaking Hindu or other comm unities."[৫৪]

অর্থাৎ, সাঁওতাল বিদ্রোহের একটা প্রধান ফল হচ্ছে, বাংলা এবং বিহারের সমতলবাসী এবং শহরের তথাকথিত শিক্ষিতদের তুলনায় আদিম এবং অসভ্য বর্বরদের কাছে মিশনারীদের দরজা খুলে দেওয়া। এই সময় থেকেই ছোটনাগপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী পার্বত্য জেলা অজস্র মিশনের দ্বারা শোভিত হয়। এ কাজের রাজনৈতিক গুরুত্ব এই যে আদিম, অসভ্য এবং বর্বরদের ব্রিটিশদের সংস্পর্শে এনে সভ্যতার মূল্য শেখানো। সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করে আদিম অসভ্য বর্বর এবং খৃষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিতদের প্রতি বিশেষ সুবিধা প্রদান করা। ফলে তাদের মধ্যে অসন্তোষের সম্ভাবনা সুদুর পরাহত হবে। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এই সময় থেকেই সংস্কারপন্থী ভারতীয়, গোঁড়া হিন্দু

৫৪, কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনসারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭, পৃ—৭২

এবং মুসলমান সম্প্রদায়ও আদিম অসভ্যদের ধর্মান্তরিত করার কাজে এগিয়ে আসে এবং ইউরোপীয়ানদের অনুসরণ করে তারাও তাদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করে। ফলস্বরূপ আদিম অসভ্যরা আর্য হিন্দু অথবা অন্য গোঁড়া সম্প্রদায়ে আত্মভূত হতে থাকে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সাঁওতাল পরগনায় মিশনারীদের জন্য দরজা হাট করে খুলে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল সাঁওতালদের খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করে, তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে, সভ্যদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় সেই বিষয়ে শিক্ষিত করা এবং তাদের উন্নতির পথের সব বাধা দূর করা। উপরের আলোচনা থেকে অন্তত তাই মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে সাঁওতালদের নির্বিচারে এবং পাইকারিহারে খৃষ্টধর্মে ধমান্তরিত করে ব্রিটিশ সরকার একদিকে যেমন সাঁওতালদের মধ্যে কিছু লোককে তাদের সমর্থক শ্রেণীতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছিল; অপর দিকে তেমনি সাঁওতালদের মত একটা বিরাট শক্তিশালী জাতির "বিশি জাং" বা Back bone বা মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এবং এই কারণেই যে সাঁওতালরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মহান বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিলেন পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের আর সে ভাবে পাওয়া যায়নি। খৃষ্টান মিশনারীদের আপত্তিজনক কার্যকলাপের অসংখ্য উদাহরণ ছোটনাগপুরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। আমি সেগুলিকে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ না করে শুধুমাত্র...আমার বক্তব্যের সমর্থনে ছটরায় দেশ মাঞ্জহির যৎসামান্য একটা মন্তব্য তুলে ধরছি :—

"In this way we santals were reduced to a great sorrow, misery, suffering and scarcity as a result of the wicked acts as well as decitful promises of getting rule from Sido and Kanhu. We lost our houses, cattle cows, bullocks and baffaloes, our food and everything, only our hands were left."*

অর্থাৎ "আমরাই আমাদের শাসক হব সিধু-কানহুর এই শঠতা এবং প্রতারনাপূর্ণ কার্যকলাপের ফলে আমরা সাঁওতালরা ভয়াবহ দুঃখ কষ্ট এবং অভাবগ্রস্ত হয়ে উঠলাম। দুটো হাত ছাড়া ঘরবাড়ি, খাবার-দাবার, গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া, মোষ-বলদ সব কিছুই হারালাম।"

ছটরায় দেশমাঞ্জহি আরো বলেছেন :

"In this way during the rebellion Santals had to lament the cruel and dectiful boasting of Sido and Kanhu."**

---

* এল. এস. এস. ও ম্যালি-বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ার সাঁওতাল পরগনা, পৃ-৩৯১

** এল. এস. এস. ও ম্যালি গ্রন্থ ঐ পৃষ্ঠা—৩৯২

অর্থাৎ, "সিধু-কানহুর নিষ্ঠুর, ধৃষ্টতাপূর্ণ দাম্ভিকতার জন্য বিদ্রোহের সময় সাঁওতালদের অশেষ দুর্গতি পোহাতে হয়েছিল।"

অথচ মজার কথা কি জানেন? সাহেবরা বলেন উলটো কথা। W. W. Hunter-এর কথা আলোচনার শুরুতেই উল্লেখ করেছি। এখানে কেবল C. E. Buckland-এর কথা বলব :

"The two brothers were men of strong personal character and brooded over the wrongs of their race."***

অর্থাৎ, "দুই ভাই এর ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল অমলিন এবং তাঁরা আন্তরিকভাবেই তাঁদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের বিরোধী ছিলেন।"

মোট কথা হল, ইংরেজরা আগাগোড়া "Divide and rule" নীতি অনুসরণ করেছেন। যেখানে এটা ছিল, সেখানে খুব বেশি কিছু করতে হয়নি; কিন্তু যেখানে ছিল না, সেখানে এটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সাঁওতালদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এই নীতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের" লেখক সুপ্রকাশ রায় মন্তব্য করেছেন :—

"সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাত হইতে শাসকগোষ্ঠী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যাহারা অনায়াসে প্রাণ দেয়, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে না, তাদের সহিত ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবাধ মিশ্রণের ফলে চারিদিকে বিদ্রোহের বীজ ছড়াইয়া পড়িবে। সুতরাং বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের ভারতীয় জনজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবার জন্য শাসকগণ সাঁওতাল পরগণাকে একটি স্বতন্ত্র জেলা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।"[৫৫]

সরকার ইতিপূর্বে Divide and rule নীতি অনুসরণ করে সাঁওতালদের জাতীয় ঐক্য এবং সংহতিকে ভাঙতে চেয়েছেন; তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় W. B. Oldham (১৮৭৯ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত সাঁওতাল পরগণার ডেপুটি কমিশনার ছিলেন) এর ক্রিয়াকলাপ এবং পরিকল্পনা রচনায়। এখানে বলে রাখা ভাল যে তাঁর আমলে (১৮৮০-৮১) জ্ঞান পারগানা এবং ভগীরথ মাঝির নেতৃত্বে খেরওয়াড় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ঐক্য এবং সংহতি তখনও অবশিষ্ট ছিল। তাকেই পুরোপুরি নষ্ট করে ফেলার জন্য Oldham নিম্নলিখিত পরিকল্পনা রচনা করেন। সরকার তাকে অনুমোদনও দেয়।

"After the completion of the cencus operation of 1881 W. B. Oldham, with a view to improve the administration and to break

*** সি. এ. বাকল্যান্ড, বেঙ্গল আন্ডার দি লেফটেনান্ট গভর্ণরস, প্রথমখণ্ড, পৃ-১২

৫৫, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়, পৃ—২৮০

up the clannish feeling among the Santals to which disturbances of 1880-81 were attributed, submitted proposals for the extension of the police system on the model of the existing in the Deoghar sub- division to the Zamindari portions of the sub-division of Godda, Pakur and Rajmahal. His proposal were fully approved by G. N. Barlow, the commissioner and Munro, Inspector General of police. The proposal were approved by Government in letter No. 270J, dated 31st July, 1882."*

বিদ্রোহের মূল নায়ক সিধু এবং কানহু ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন যে, তাঁরা এবং বিদ্রোহীরা ভেবেছিলেন চাঁদ বঙ্গার দয়ায় (চাঁদ-এর দয়া) বন্দুকের সব গুলি জল হয়ে যাবে। এই বক্তব্যের সমর্থনে আমি এখানে ছোট্ট একটা উদাহরণ রাখব :—

"At first the soldiers fired blank shots just to frighten them. On this, the simple minded Santals, not understanding boasted that their guns were not working and that all their bullets were being blown away like air. They said that their Bonga was superior and more powerfull and so they greduaily went closer and closer."

"When they saw this the soldiers began to fire at them wildly like the burning of fried maize. The people fell down, one of top of each other and were stuck togather with blood, and over the whole field there was blood running. Some people then jumped into the flooded. More river and from fear of being shot to death were drowned, and some were carried away by the current. In this way numbers lost their lives and countless people died." (Chotrae deshmanjhis" account, from Bengal district Gazetteers, SANTAL PARGANAS)**

অর্থাৎ, "তাদের ভয় দেখাবার জন্য সৈন্যরা প্রথম গুলির ফাঁকা আওয়াজ করল কিন্তু, মাথামোটা সাঁওতালরা সেটা বুঝতেই পারল না, তারা ভাবল বন্দুকের গুলি (কার্তুজ) জল হয়ে হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। ওরা ভাবল তাদের চাঁদ বঙ্গা গুলির চেয়েও বড় এবং শক্তিশালী; তাই তারা ক্রমশ কাছে চলে এল। সৈন্যরা যখন দেখল তারা কাছে চলে এসেছে তখন গরম কড়াই-এ খৈ (ভুট্টা) ভাজার মত পাগলের ন্যায় এলোপাথাড়ি গুড়ি ছুঁড়তে শুরু করল।

*Bihar district gazetteers Santal Pargana, P. C. Roychoudhury, পৃ. ১১৬

** এল. এস. এস. ও ম্যালি, গ্রন্থ ঐ পৃ—৩৯১/৩৯২

তার ফলে বিদ্রোহীরা একে অন্যের ঘাড়ে কাটা গাছের মত পড়তে লাগল, রক্তের তীব্রতায় একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়েও পড়ল। গোটা মাঠে রক্তের নদী বইতে লাগল। সেনাবাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারাবার ভয়ে কেউ মোর নদীতে ঝাঁপ দিল। কেউ তলিয়ে গেল; আবার কেউ কেউ নদীর প্রবল স্রোতে বয়ে গেল। এইভাবে অনেকেই নদীতে ডুবে মরল, অনেকে আবার গুলি খেয়ে মরল।"

তাঁদের এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত সেটা প্রমাণ করার জন্য আমি কেবলমাত্র দুটো উদাহরণই দেব। সেটা আজগুবি প্রমাণের জন্য দুটো উদাহরণই যথেষ্ট—

"It was not war, one of them said to me, it was execution, we had, orders, to go out whenever we saw the smoke of a village rising above the jungle. The Magistrate used to go with us. I surrounded the village with my sepoys and the Magistrate called upon the rebels to surrender. On one occassion, the Santals forty five in number, took refuse in a mud house. The Magistrate called on them to surrender, but the only reply was a shower of arrows from the half opened door. I said, Mr. Magistrate this is no place for you, "and went up with my sepoys, who cut a large hole through the wall. I told the rebels to surrender, or I should fire in. The door again half opened, and a volleys of our arrows was the answer. A company of sepoys advanced and fired through the hole. I once more called in the inmates to surrender, while my man reloaded. Again the door opened, and a volleys of arrows replied. Some of the sepoys were wounded, the village was burining all round us, and I had to give the men orders to do their works. At every volley we offered quarter; and at last, as the discharge of arrows from the door slackened, I resolved to rush in and save some of them alive, if possible. When we got inside we found only one old man, dabbled with blood, standing erect among corpses. One of my man went up to him calling him to throw away his arms. The old man rushed up of the sepoys and hewed him down with his battle axe"[৫৬]

(মন্তব্যটি মেজর ভিনসেন্ট জারভিসের, যিনি সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন)

৫৬, ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার, দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল পৃ—১৭০

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে একজন আমাকে বললেন, এটা যুদ্ধ নয়, এটা গণহত্যা। আমাদের কাছে নির্দেশ ছিল, জঙ্গলের মধ্যে যখনই কোন গ্রাম থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখবে সেখানে চলে যাবে। ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতেন। আমি আমার বাহিনী দিয়ে গ্রাম ঘিরে ফেলতাম এবং ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে বলতেন। একটা ঘটনা বলি, বিদ্রোহীরা সংখ্যায় জনা পঞ্চাশ হবে, একটা মাটির কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। ম্যাজিস্ট্রেট তাদের আত্মসমর্পণ করতে বললেন, উত্তরে দরজা একটু ফাঁক হল, তারপরেই এক ঝাঁক তীর বেরিয়ে এল। আমি ম্যাজিস্ট্রেটকে বললাম, মিঃ এটা আপনার উপযুক্ত জায়গা নয় এবং আমার সিপাহীদের নিয়ে আমি এগিয়ে গিয়ে সিপাহীদের দেওয়ালের গায়ে ফুটো করতে বললাম। তারা তাই করল। আমি বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণ করতে বললাম, অন্যথায় আমি গুলি চালাতে বাধ্য হব বলে জানিয়ে দিলাম। উত্তরে আগের মতই দরজা একটু ফাঁক হল এবং এক ঝাঁক তীর বেরিয়ে এল। আমার বাহিনীর একটা দল এগিয়ে গেল এবং গর্তের ফাঁক দিয়ে গুলি চালাল। আমি পুনরায় তাদের আত্মসমর্পণ করতে বললাম এবং আমার লোকেরা ততক্ষণে বন্দুকে গুলি ভরে তৈরি হয়ে নিল। পুনরায় দরজা একটু ফাঁক হল এবং উত্তরে এক ঝাঁক তীর বেরিয়ে এল। সিপাহীদের কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছিল। আমাদের চতুর্দিকে গ্রামকে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আমার বাহিনীর লোকজনকে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে বললাম। প্রত্যেকবারই গুলির বিনিময়ে এক ঝাঁক তীর বেরিয়ে আসতে লাগল। অবশেষে যখন তীর আসা বন্ধ হয়ে গেল, আমি ভেতরে ঢুকলাম, যদি পারি কয়েকজনকে বাঁচাতে চাইলাম। ভেতরে যখন ঢুকলাম তখন দেখতে পেলাম চতুর্দিকে শবের মাঝখানে একজন মাত্র বৃদ্ধ যার গোটা শরীর রক্তে ভেজা ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার একজন সিপাহী ছুটে গিয়ে তাকে অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলল। জবাবে সেই বৃদ্ধ সিপাহীর দিকে ছুটে গেল এবং হাতের অস্ত্র দিয়ে তার ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দিল।"

আচ্ছা বলুন তো, এর পরেও কি স্বীকার করতে হবে—বিদ্রোহীরা বন্দুকের সব গুলি জল হয়ে যাবে বলে ভেবেছিলেন? চতুর্দিকে শব মাঝখানে একজন মাত্র বৃদ্ধ মানুষ মৃত্যুর অপেক্ষায়, তাকে যখন আত্মসমর্পণ করতে বলা হল তখন সে হাতের অস্ত্র দিয়ে একজন সিপাহীর ধড় থেকে মাথা আলাদা করে দিল। এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয় :

"It was not war; the commanding officer went on to say;

they did not understanding yeilding. As long as their national drums beat, the whole party stand, and allow themselves to be shot down. Their arrows often killed our man, and so we had to fire on them as long as they stood. When their drum ceased, they would move out for about a quarter of mile; then their drums began again and they calmly stood till we came up and poured a few volleys into them. There was not a sepoy in the war who did not fell ashamed of himself. The prisoners were for the most part wounded men. They upbraided us with fighting against them. They always said it was with the Bengalis they were at war, not with the English. If a single englishman had been sent to them who understood their wrongs, and would have redresed them, they declared there would have been no war. It is not true that they used poisoned arrows. They were the most truthfull set of men I ever met; brave to infatuatin. A lieutenent of mine had once shoot down seventy five man before their drum ceased, and the party fell back.''[৫৭]

অর্থাৎ, ''কমান্ডিং অফিসার বলে চলেছেন, না এটা কোন যুদ্ধই নয়। আত্মসমর্পণ কাকে বলে তারা জানে না। যতক্ষণ তাদের জাতীয় বাদ্য নাগড়ার আওয়াজ শোনা যেত ততক্ষণ দলের সবাই দাঁড়িয়ে থাকত এবং আমাদের গুলি করবার সুযোগ করে দিত। তাদের তীর আমাদের বাহিনীর খুচরো দু একজনকে মারত বটে, তাই আমরা তারা যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত গুলি করে মারতাম। যখন তাদের নাগড়ার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেত তখন তারা সিকি মাইল দূরে চলে যেত, তারপর যখনই তাদের নাগড়ার আওয়াজ শুরু হত তারা পুনরায় শান্ত ধীর স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে পড়ত এবং আমরা আমাদের বন্দুক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বৃষ্টি করতাম। আমাদের দলে এমন সিপাহী কেউ ছিল না যার লজ্জা করেনি। কয়েদিরাই সব থেকে বেশি আহত হয়েছিল। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ওরা আমাদের ভর্ৎসনা করে বলত আমাদের লড়াইত বাঙালী মহাজনদের বিরুদ্ধে, তোমাদের সঙ্গেত আমাদের বিবাদ কিছুই নাই। যদি কোনো একজন ইংরেজকে তাদের কাছে পাঠন হত, যে তাদের (অবস্থা) অসুবিধা বুঝতে পারত এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করত তাহলে যুদ্ধের প্রয়োজনই হত না। তারা বিষাক্ত তীর ব্যবহার করেছিল একথা সত্য

৫৭, ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার, দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল পৃ—১৭১

নয়। তারা ছিল আমার দেখা বিশ্বাসভাজনদের অন্যতম, তাদের সাহসিকতা তারিফ করার মত আমার একজন লেফটেনান্ট তাদের নাগড়ার আওয়াজ বন্ধ হবার আগেই ৭৫ জনকে গুলি করে মেরে ফেলার পরেই তারা পিছিয়ে এসেছিল।"

এটা কোনো সাঁওতালের মনগড়া কাহিনী নয়। সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একজন পেশাদার সৈনিক মেজর ভিনসেন্ট জার্ভিসের (দুটো মন্তব্যই তাঁর) কথা। বিদ্রোহীদের সামনে সেদিন পালাবার পথ উন্মুক্তই ছিল কিন্তু তারা লড়াই এর ময়দান থেকে পালিয়ে যায়নি। আত্মসমর্পণ দূরের কথা লড়াই-এর ময়দানে বুক পেতে দিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে চিৎকার করে বলেছিল, ভীরু কাপুরুষের দল! মার গুলি। এর পরেও কেউ যদি বলেন সাঁওতাল বিদ্রোহীরা আশা করেছিলেন চাঁদ বঙ্গার (চন্দ্রদেব) দয়ায় বন্দুকের সব গুলি জল হয়ে যাবে তাহলে বলার আর কিছুই থাকে না। সাঁওতালদের অসম সাহসিকতা ও দৃঢ়চেতা প্রত্যক্ষ করে সুপ্রকাশ রায় মন্তব্য করেছেন :

"১৮৫৫-৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ ভারতের কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে অতুলনীয়। কেবলমাত্র ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সহিত ইহার আংশিকভাবে তুলনা করা চলে। যে প্রকারের শাসন, শোষণ ও উৎপীড়ন হইতে পরাধীন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের সৃষ্টি হয় ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল উপজাতির বিদ্রোহ বা স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ বা "ভারতের প্রথম ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রাম" সেই প্রকারের শাসন, শোষণ ও উৎপীড়নেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই উভয় সংগ্রামই আরম্ভ হয়েছিল ইংরাজ শাসনের কবল হইতে, শোষণের কবল হইতে মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ধ্বনি লইয়া।"[৫৮]

অন্যদিকে Statesman-এর পূর্ব পুরুষ Friend of India বিদ্রোহে সাঁওতালদের অসম সাহসিকতা ও দৃঢ়চেতা প্রত্যক্ষ করে দ্বিগবিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে বিদ্রোহ দমনের অব্যবহিত পরেই বিদ্রোহীদের কঠোর শাস্তি দেবার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। কারণ স্পষ্ট। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ তখনো হয়নি। কিন্তু ১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ জাতীয়বাদের উন্মেষের পথকে সুগম করেছিল। তার ফলে ভারতবর্ষে ইংরেজদের ভবিষ্যত পরিণতির কথা চিন্তা করে প্রভুভক্ত Friend of India প্রভুর উচ্ছিষ্ট লাভের আশায় তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়ে বলেছিল :

৫৮, সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃ.-২৫৭

"It is only by striking terror into these blood thirsty savages, who have respected neither age nor sex, that we can hope to quell this insurrection. It is neccssary to avange the out raged committed, and to protect the cultivators of the plains from a repeatition of them. The Santal believe that they can enjoy the luxury of blood and plundered for a month without certainty of retribution. It is absolutely necessary that this impression be removed or obliterated, if Government would not in these districts sit on bayonet points, To achieve this end, the retribution must be complete, leaving no calculation of chances for future rioters. So striking that none may fail to know and understand; and so tremendous that people may know their lives and happiness are not held of light account. It is to Pegu that we would convey the Santals, not one or two of the ring leaders, but the entire population of the infected districts. India has not arrived at the points where armed rebellion can be treated with the contemptuous forbearance, with which an English Ministry can pardon a knot of chartist or banish a gang or Irish Patriots. Let the Santal punishment be entrusted to a special commision as was done in Canada in 1838. Or even if this expedient be too arbitary, let the villages be fined in an amount about equal to the plundered retained, and the sum distributed amongst the sufferers. To secure the punishment of the race and restored the prestige of British authority, the mass of the Santals should not remained unpunished."[৫৯]

অর্থাৎ, "এইসব আদিম অসভ্য বর্বর এবং রক্তপিপাসু যারা নারী পুরুষ নির্বিবাদে কাউকেই রেহাই দেয় না তাদের অন্তরে আঘাত হেনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেই বিদ্রোহ দমন করতে হবে। সমতলের কৃষককে পুনরায় দৌরাত্মের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দৌরাত্ম সৃষ্টিকারীদের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা একান্ত প্রয়োজন। সাঁওতালরা মনে করে যে, তারা কোনো রকম প্রতিফল ছাড়াই মাসের পর মাস হিংসা, খুন, খারাবি ও লুটপাট চালাতে পারে। এটা একান্তভাবেই প্রয়োজন যে, তাদের মন থেকে এই ধারণাকে পুরোপুরিভাবে দূরীভূত করতে

৫৯, কে. কে. দত্ত, দি সান্থাল ইনসারেকশন অব ১৮৫৫-৫৭, পৃ.-৬৭

হবে, তাদের মন থেকে মুছে দিতে হবে। সরকার যদি এইসব জেলায় বন্দুকের নল দিয়ে বিদ্রোহীদের মোকাবিলা না করে তবে উপরোক্ত ধারণাকে দূর করতে পারবে না। এটা অর্জন করার জন্য সরকারকে এমন প্রতিহিংসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ভবিষ্যতে বিদ্রোহের জন্য আর কেউ সাহস না দেখায়। বিদ্রোহীদের উপর এমন আঘাত হানতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ মনে করে যে, তাদের জীবন এবং সুখদুঃখের জন্য সরকার আন্তরিকভাবেই দায়বদ্ধ। বিদ্রোহের দু' একজন মূল নায়ক নয়, উপদ্রুত অঞ্চলের সবাইকেই আমরা পেগু অঞ্চলে চালান করে দেব। ভারতবর্ষ এখনো এমন জয়াগায় পৌঁছয়নি যে, সশস্ত্র বিদ্রোহকে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার মত চার্টিস্ট আন্দোলনকারীদের ক্ষমা করে দিতে পারে অথবা স্বাধানতাকামী আইরিশ বিদ্রোহীকে বিতাড়িত করতে পারে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কানাডায় যা হয়েছিল সাঁওতাল বিদ্রোহীদের শাস্তির জন্যও একজন স্পেশাল কমিশনার নিয়োগ করতে হবে। যদি এই ব্যবস্থা অতিরিক্ত মনে হয় তবে যে পরিমাণ দ্রব্য বিদ্রোহীরা লুঠ করেছে তার সমপরিমাণ জরিমানা গ্রাম থেকে আদায় করে উপদ্রুত অঞ্চলে বিলির ব্যবস্থা করা হউক। ব্রিটিশের মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য বিদ্রোহীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং দেখতে হবে সাঁওতালদের মধ্যে কেউ যেন শাস্তির হাত থেকে রেহাই না পায়।''

ভাবা যায়? একজন বা দুজন বিদ্রোহের নায়ক নয়, গোটা সাঁওতাল সমাজকেই বিদ্রোহের জন্য খেসারত দেবার সুপারিশ করা হয়েছিল ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকারের কাছে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে অনেক দেশভক্ত ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায় বলে অভিহিত করে থাকেন। আবার অনেকে এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্যায় বলে মানতে নারাজ। মহাবিদ্রোহের সূচনা করেছিলেন সিপাহিরা। এই কারণে এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। সাঁওতাল বিদ্রোহের এক বছর পর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ যে, এই মহাবিদ্রোহকে প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা যুগিয়েছিল দু একটা উদাহরণ দিলেই সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহ শুরুই হয়েছিল ব্যারাকপুরে। ব্যারাকপুর থেকে বিদ্রোহ মীরাটে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরে দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহ যেখান থেকে প্রথম শুরু হয় সেই ব্যারাকপুর থেকেই মেজর ভিনসেন্ট জার্ভিস সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করতে গিয়েছিলেন এবং বিদ্রোহ দমনে গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের প্রতি তাঁর

দৃষ্টিভঙ্গি আমি ইতিপূর্বে দু জায়গায় উল্লেখ করেছি এখানে তাঁর তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরলাম—

"One evening. Says an officer who played an important part in putting down the rebellion. 'When my regiment was at Barrackpore, the colonel sent for me and ordered me to march next morning with a detachment to Raneegunge, in Beerbhoom, as the hill tribes had broken out. I had heard nothing of the affair before, nor was it, so far as I remember, talked of in military circles. Next morning I started at 4 A.M. and reached Burdwan by train about breakfast time. The commissioner (the chief Civil officer on that division of the province) came to me and ordered me to push on direct on Soorie, the capital of Beerbhoom, as it was in instant danger of attack. We marched for two days and a night, the rain pouring the whole way, and my men without any regular food. As we came near to Soorie, we found panic in every village. The Hindus fairly lined the road, welcoming us with tears in their eyes, and pressing sweet meats and parched rice upon my exhausted sepoys. At Soorie we found things, if possible worse. One officer Kept his horse saddle day and night. The Jail seem to have been hastily fortified and the bulk of the coin from the treasury was said, I know not with what truth to be hid in a well."[৬০]

অর্থাৎ,"একজন অফিসার, যিনি সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, বললেন, একদিন সন্ধ্যায় আমার বাহিনী যখন ব্যারাকপুরে অবস্থান করছিল, কর্নেল আমাকে ডেকে একদল বাহিনী নিয়ে পরদিন প্রাতে রানীগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হতে বললেন, কারণ, পার্বত্য উপজাতির লোকেরা বীরভূমে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ইতিপূর্বে আমি এ বিষয়ে কিছুই শুনি নাই এবং আমার যতদূর মনে পড়ে Military circle-ও এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হয় নাই। পরদিন প্রাতে ৪টের সময় আমি রওনা দিয়ে প্রাতরাশের সময় ট্রেনে করে বর্ধমানে পৌঁছলাম। কমিশনার (ঐপ্রেসিডেন্সির ডিভিশনের প্রধান) আমার কাছে এসে বীরভূমের রাজধানী সিউড়ি অভিমুখে যাত্রা করতে আদেশ দিলেন

৬০, ডাবলিউ. ডাবলিউ. হান্টার, দি অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল, পৃ.-১৬৭

যেহেতু সিউড়ি যে কোন সময় আক্রান্ত হতে পারে বলে খবর। আমি আমার লোকজন নিয়ে কোনোরকম খাদ্য ছাড়াই বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দুদিন এবং একরাত্রি হেঁটে চলেছি। সিউড়ির কাছাকাছি পৌছে আমরা দেখতে পেলাম প্রত্যেকটা গ্রামে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। হিন্দুরা আমাদের দেখে সুশৃংখলভাবে সারিবদ্ধ হয়ে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল, চোখের জল দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল, মিঠাই এবং চালভাজা দিয়ে আমাদের বরণ করে নিল। সিউড়িতে পৌছে দেখলাম একজন অফিসার ঘোড়ার পিঠে অহরহ জিন লাগিয়ে তৈরী হয়ে আছেন আর আমি জানি না ঠিক কি কারণে কোষাগারের সমস্ত ধাতুমুদ্রা কুয়োয় লুকিয়ে রাখা হয়েছে।"

মেজর ভিনসেন্ট জার্ভিস ব্যারাকপুর থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করতে এসেছিলেন। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তা ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ যাকে মহাবিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া হয়, তাও এই ব্যারাকপুর থেকেই শুরু হয়েছিল এবং পরে মীরাটে ছড়িয়ে পড়েছিল, সে কথাও বলা হয়েছে। একজন পেশাদার সৈনিক মেজর ভিনসেন্ট জার্ভিসের যদি বিদ্রোহ দমন করতে এসে এইরকম মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় তাহলে সাধারণ সৈনিকদের মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে সারা ভারতবর্ষকে নিজেদের দখলে এনে ব্রিটিশদের একটা ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল। ভাতরবাসীর চোখে তারা হয়ে উঠেছিলেন হিরো। ব্রিটিশ সিংহ। কিন্তু ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ তাদের সেই ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করেছিল। সে কথা Friend of India-র মন্তব্য থেকে পরিস্কার বোঝা যায়। (To securc the punishement of the race and restored the presitige of British authority) ইউরোপবাসীদের কাছে ফ্রান্সের নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন অপরাজেয় শাসক। তিনি এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং গোটা ইউরোপকে তাঁর অধীনে এনেছিলেন। কিন্তু মস্কো অভিযানের পর তিনি পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়ে দেশে ফিরলে তাঁর অপরাজেয় ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যায়। ইউরোপবাসী বুঝতে পারে যে, নেপোলিয়ানকেও পরাজিত করা যায়। অনুরূপভাবে ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের সাঁওতাল বিদ্রোহারীও ব্রিটিশ সরকারের অপরাজেয় ভাবমূর্তি নষ্ট করে দেয়। সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত সেনাবাহিনী বুঝতে পারে যে, ব্রিটিশ সিংহ নয়, শার্দুলত নয়ই, তাঁরা হলেন এক সাধারণ নেকড়ে। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা

ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে ভারতবাসীর কাছে একথা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করে সিপাহীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে দেরী করেননি। অতএব নিরপেক্ষ বিচারে সাঁওতাল বিদ্রোহকেই ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে অভিহিত করা যায়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। তাঁর কথায়—

"In the whole, it is difficult to avoid the conclusion that the so called first National war of Independance of 1857 is neither first, nor national, nor a war of Indipendance"[৬১]

অর্থাৎ,"অবশেষে, উপসংহারে এসে একথা কিছুতেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের তথাকথিত প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম না ছিল প্রথম, না ছিল জাতীয় অথবা না ছিল আদৌ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম। তাঁর মতে যদি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করতেই হয় তাহলে—

"In conclusion, attention may be drawn to the rebellion of Surendra sai at Sambalpur in 1827 and that on the Santals in 1856. If the latter rebellion of the same Surendra Sai in 1857 for the same cause and carried on the the same maner may be regarded as a war of independence, there is no reason why the earlier rebellion should not be honoured by the same epithet. As regards the Santal rebellion, it would bear comparison with that of Shababad in 1857 as regards the intensity on anti British spirit, organisation and geographical area. If therefore, the isolaled out breaks in 1857 in different areas are to be regarded as war of independence, it is difficult to deny the same honour to the ardour strugle carried on by the santals or Surendra Sai, and Perhaps many others described in chafter xiv. The out break of 1857 has therefore, little claim to be hailed as the first war on independence"[৬২]

অর্থাৎ, "উপসংহারে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের সম্বলপুরের সুরেন্দ্র সাই-এর সংগ্রাম

৬১, R. C. Majumdar, British Paramountcy and Indian Renaissance, p.-625

৬২, আর. সি. মজুমদার, ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসি এন্ড ইন্ডিয়ান রেঁনেসা, পৃ.-৬২৪

এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের দিকে দৃষ্টি দিতেই হয়। একই কায়দা, একই কারণে সংঘটিত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সুরেন্দ্র সাইএর সংগ্রামকে যদি স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয় তাহলে কেন পূর্ববর্তী সংগ্রামকে একই বিশেষণে ভূষিত করা হবে না। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সাহাবাবাদের বিদ্রোহে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের তীব্রতা, ভৌগলিক আয়তন এবং সংঘটিত করার সঙ্গে সাঁওতাল বিদ্রোহের মিল লক্ষ করা যায়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় সংঘটিত চোরাগোপ্তা বিদ্রোহকে যদি স্বাধীনতা সংগ্রাম নামে অভিহিত করা হয় তাহলে কেন সাঁওতাল, সুরেন্দ্র সাই অথবা চর্তুদশ অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যদের মহান সংগ্রামকে সেই সন্মান দেওয়া হবে না? ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সংগ্রামকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে অভিহিত করার সুযোগ খুবই কম।"

ভি, রাঘবাইয়া তাঁর 'ট্রাইবাল-রিভোল্টস" গ্রন্থে এবং সুপ্রকাশ রায় তাঁর "ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম" গ্রন্থে পরোক্ষভাবে এই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। ভি, রাঘবাইয়া বলেছেন :—

"It should not be forgotten in this connection that the great indian freedom fight of 1857, miscalled mutiny, was in its embryonic stage about the time of the Santal struggle and should have received not only valuable inspiration but even costly lessons from the mistake of the Santal pioneers though the mighty movement of independence also met with the same fat as on the Santals. In both struggles the enemy was common. Both the struggles were fought with enequal strength. Both had traitors and renegades to count with, and in both the primary leaders had to pay with the life on the scaffold. In both the flame of patriotism glowed with resplendent purity, patriotism, self sacrifice and unrivalled fervour. Both failed in one sense and according to one set of standards, but both still triumphed in another sense and according to different standards. Surely the Santal heroes gave their, "today for the tomorrow on their Indian brethren and must have proclainmed from their patriotic and heroic stand on the gallows as the heroic fighters at the battle of Kohima (Nagaland) in one voice exclaimed.

"Go and tell them that we have given OUR TODAY FOR

THEIR TOMORROW."[৬৩]

অর্থাৎ,"এ প্রসঙ্গে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ভারতবর্ষের ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ যাকে ভুল করে সিপাহী বিদ্রোহের নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে সেটা সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় ভ্রূণাবস্থায় ছিল। সেই মহাবিদ্রোহ সাঁওতাল বিদ্রোহের কাছ থেকে মূল্যবান অনুপ্রেরণাই শুধু নয়, বিদ্রোহের পথিকৃতদের ভুল থেকেও মূল্যবান শিক্ষালাভ করেছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাঁওতাল বিদ্রোহের মত স্বাধীনতার মহান বিদ্রোহও ব্যর্থ হয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই শত্রু ছিল এক এবং অভিন্ন। উভয়ের সংগ্রামও ছিল অসম শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বাসঘাতক এবং দলত্যাগী ছিল এবং সাঁওতাল বিদ্রোহের মত মহাবিদ্রোহের মূল নায়কদেরও ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। উভয়ক্ষেত্রেই স্বদেশপ্রেমের অতুলনীয় উজ্জ্বল দীপ্তি দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগে অম্লান হয়ে আছে। একদিকে থেকে দুই বিদ্রোহই ব্যর্থ হলেও অন্যদিক থেকে তারা সফল। সাঁওতাল বিদ্রোহের বীরপুরুষরা নিশ্চিতভাবেই তাদের বর্তমানকে ভারতীয় ভাইদের আগামী দিনের জন্য উৎসর্গ করেছিল এবং ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে দেশভক্তি এবং বীরোচিত কণ্ঠে কোহিমায় (নাগাল্যান্ড) যুদ্ধরত বীর সেনানীদের মত ঘোষণা করে অবশ্যই বলেছিল,

"যাও এবং তাদের বল আমাদের বর্তমানকে তাদের আগামীদিনের জন্য উৎসর্গ করলাম।"

সুপ্রকাশ রায় একধাপ এগিয়ে বলেছেন :

"সাঁওতাল উপজাতির এই স্বাধীনতার যুদ্ধ যে, পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের জনসাধারণকে এবং দুই বৎসর পরের মহাবিদ্রোহে (১৮৫৭) স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। বর্তমান কালে অসভ্য ও বন্য বলিয়া পরিচিত যে উপজাতি একশত বৎসরের অধিককাল পূর্বে সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা সংগ্রামের শিক্ষা ও প্রেরণা দান করিয়াছিল, তাহাদের অতীত ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের মূল্যবান উপাদান।"[৬৪]

বটে তো, বটেই তো।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জালিয়ানওয়ালাবাগ স্মরণীয় হয়ে আছে, কিন্তু

৬৩, ভি. রাঘবাইয়া, ট্রাইবাল রিভোল্টস, পৃ.-১৫৬

৬৪, সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গনতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃ—২৫৮

আশ্চর্যের বিষয় কি জানেন? জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সাঁওতাল বিদ্রোহের কাছে নস্যি।

ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার রাউলাট কমিটির সুপারিশে স্থায়ী ও ব্যাপক আইন প্রণয়নের জন্য উদ্যোগী হয়। এই আইনের প্রতিবাদে আসমুদ্র হিমাচল উত্তাল হয়ে ওঠে, এতদসত্ত্বেও ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে আইনটি অনুমোদিত হয়। ফলে ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন সদস্য, যেমন পণ্ডিত মদন মোহন মালবীয়, মহম্মদ জিন্না, পণ্ডিত বিষ্ণু দত্ত শুক্ল ইত্যাদি পদত্যাগ করেন। গান্ধীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলনের হুমকি দিয়ে রেখেছিলেন। তাই সত্যাগ্রহের পরিবর্তে সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। পঞ্জাবে বিস্ফোরক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ৯ই এপ্রিল ডাঃ সত্যপাল ও সফিউদ্দিন কিচলুকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন অমৃতসরে হরতাল পালিত হয়। এদিন সমবেত জনগণ যখন সমবেতভাবে রেল স্টেশনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলি চালায়, অতঃপর জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে কয়েকটি সরকারি অফিস ও ব্যাঙ্কে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ইংরেজদের উপর চড়াও হয়, ফলে কয়েকজন নিহত হন। কর্তৃপক্ষ শহরে সৈন্য মোতায়েন করে, সভা, সমিতিও নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। শান্তি রক্ষার ভার জেনারেল ও-ডায়ারের ওপর ন্যস্ত হয়। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এবং ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ কিচলুর মুক্তির দাবিতে ১০,০০০ মানুষ সমবেত হয়। কোনোরকম সতর্কবার্তা ছাড়াই জেনারেল ও-ডায়ার সমবেত জনতার উপর গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। জালিয়ানওয়ালাবাগে আগমন ও নির্গমনের জন্য একটাই মাত্র দরজা ছিল। গুলির আওয়াজে আতঙ্কিত লোকজন প্রাণভয়ে পালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু যেহেতু আগমন ও নির্গমনের জন্য একটাই মাত্র দরজা ছিল, তাই গুলির আঘাতে ও পদপিষ্ট হয়ে কিছু লোক মারা যায়। সরকারি মতে মৃতের সংখ্যা ৩৭৯ কিন্তু বেসরকারি মতে এই সংখ্যা ১০০০। অন্য দিকে সাঁওতাল বিদ্রোহে মৃতের সংখ্যা কম করেও ২৫,০০০; যাদের ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছিল, বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এল. নটরাজনের 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ'-এ তার জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায় :—

"অবিচলিত নিষ্ঠা ও মৃত্যুভয়হীন শৌর্য-বীর্য সত্ত্বেও সাঁওতাল সংগ্রামের

ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। ভারতের বাকি অংশ ছিল নিস্তরঙ্গ; বিশাল সাম্রাজ্যের বিরাট সামরিক শক্তি সংহত করা হল সাঁওতালদের বিরুদ্ধে। তাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্যের সংখ্যা লক্ষের কোটা পার হয়ে গেল। কোন কোন সৈন্য ঘাঁটিতে ১২ থেকে ১৪ হাজার পর্যন্ত সৈনিক সমাবেশ করতে হয়েছিল, বিদ্রোহীদের বিতাড়িত করবার জন্যে। ব্যালফোবের ভারতের বিশ্বকোষে, নিয়োজিত সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যালীলাকে আড়াল করার ব্যর্থ চেষ্টা করেও বলা হয়েছে :

"রক্তপাত না করে বিদ্রোহ দমন করা হয়নি। তারপরে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে বলা হয়েছে, বাস্তবিকপক্ষে বিদ্রোহীদের শতকরা পঞ্চাশজনই মারা পড়ে।" অর্থাৎ ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বিদ্রোহী সাঁওতালের মধ্যে পনের থেকে পঁচিশ হাজার জনকেই খুন করা হয়েছিল। জুলাই আর আগস্ট মাসের সেই অবিস্মরণীয় দিনগুলিতে রাজমহল পাহাড় রঞ্জিত হয়েছিল সাঁওতাল বীরদের উষ্ণ শোণিতে।*

এইভাবে নির্মম নিষ্পেষণ আর নির্বিচার বিচার প্রহসনের মাধ্যমে সাঁওতাল বিদ্রোহকে দমন করা হল। কিন্তু তাদের রক্ত যে বৃথা যায়নি তা বলাই বাহুল্য। এল. নটরাজন 'ভারতের কৃষক বিদ্রোহ' গ্রন্থে সে কথা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করেছেন।

"মহান সাঁওতাল অভ্যুত্থানকে এইভাবে দমন করা হল—নির্মম নিষ্পেষণ আর নির্বিচার বিচার প্রহসনের মাধ্যমে। কিন্তু এর আহ্বান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকল যুগ যুগ ধরে। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুনের সূর্যগর্ভ রাত্রিতে ভগনাডিহির সাঁওতাল কৃষকরা যে আহ্বান ধ্বনিত করেছিল তারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল ১৮৬০ সালের নীল (বিদ্রোহ) ধর্মঘটে। ১৮৭২ সালের পাবনা ও বগুড়ার অভ্যুত্থানে, ১৮৭৫-৭৬ সালে পুণা ও আমেদনগরে মারাঠি কৃষকদের বিদ্রোহে। এই বিদ্রোহ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকল সমগ্র ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত, শুরু হল জমিদার ও মহাজনী উচ্ছেদের দেশজোড়া আন্দোলন। সাঁওতাল কৃষকদের রক্ত বৃথাই ব্যয় হয়নি।

মৃত্যুহীন সাঁওতাল শহীদদের সেলাম। তোমরাই প্রথম তুলে ধরেছিলে গণসংগ্রামের নিশান। সেই নিশানই আজ গোটা দেশ জুড়ে কোটি কোটি হাতে জ্বল জ্বল করছে বিরতিবিহীন সংগ্রামের শোণিত-বঞ্চিত অঙ্গীকারের নিশানা হিসাবে।"**

* ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, এল, নটরাজন, পৃষ্ঠা—৩৪/৩৫

** ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, এল. নটরাজন, পৃষ্ঠা—৩৮

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ভারতবর্ষের মানচিত্রে সাঁওতাল পরগণার আত্মপ্রকাশ সমগ্র সাঁওতাল জনগণের কাছে অত্যন্ত গর্বের তথা অহংকারের বিষয়। ভারতবর্ষ আদিবাসীদের আদি বাসভূমি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাদের অনেকেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও একমাত্র সাঁওতাল ছাড়া আর কেউ নিজেদের নামে জেলার নামকরণ করতে পারেনি। মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মনিপুর ইত্যাদি তো হালের ঘটনা; স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্বে ভারতবর্ষের বুকে সাঁওতাল পরগণার জন্মকে অবশ্যই যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী বীর শহীদ তাদের রক্ত দিয়ে ভারতবর্ষের মানচিত্রে তাদের উত্তরসূরীদের জন্য সাঁওতাল পরগণা গঠন করেছিলেন। এল. নটরাজন যথার্থই বলেছেন :—

"ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতের মাটিতে এই প্রথম গণফৌজের আবির্ভাব; ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে এ বাহিনী তৈরি নয়, এ বাহিনী তৈরি হয়েছিল অত্যাচরীর বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় সংগঠিত কৃষকদের নিয়ে। অত্যন্ত অল্প সময়ের বিজ্ঞাপনে দশ হাজারেরও বেশি মানুষ এক জায়গায় জড়ো হত, আবার ছড়িয়ে পড়তে পারত। এই ঘটনা বিদ্রোহী কৃষকদের সংগঠন ও শৃঙ্খলার পরম নিদর্শন।"*

সাঁওতাল বিদ্রোহের সঠিক মূল্যায়ন যে আজও হল না তার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের ভূমিকা রচনার লেখক গোপীনাথ সেন খেদোক্তি প্রকাশ করেছেন :—

"১৮৫৭ সালের সিপাই মিউটিনিকে আমরা ইতিহাসে বিশেষ স্থান দিয়েছি কিন্তু ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ যে তৎকালীন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এক যবনিকাপাতের সৃষ্টি করেছিল তাহা ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেননি। তাদের বিদেশী শাসক ও দেশী শোষকদের প্রতি বিক্ষুব্ধতা যে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীজ বপন করে এক সমাজবাদী সমাজ সৃষ্টি করার প্রেরণা যুগিয়েছিল এতে কোন সন্দেহ নাই। ১৮৫৭ সালের সংগ্রামের অন্তর্নিহিত মূলে আদিবাসীদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, তাহা বহিঃপ্রকাশ না হলেও তার অদৃশ্য শক্তিধারা প্রবাহমান ছিল, তাহা স্বীকার করতে হয়।"**

ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, এল নটরাজন, পৃষ্ঠা—২৯

' স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের ভূমিকা, গোপীনাথ সেন, পৃ.-২৪

১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহে ভাগলপুর থেকে শুরু করে বীরভূম পর্যন্ত এমন কোনও গ্রাম ছিল না যারা বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি। ১৪ বছরের কিশোর থেকে শুরু করে ৮০ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত এমন কোনও লোক ছিল না যারা বিদ্রোহে যোগদান করেনি।

অতএব নিরপেক্ষ বিচারে সাঁওতাল বিদ্রোহকেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্ব বা পর্যায় হিসেবে অভিহিত কবা যায়। তাই যদি হয়, তবে কেন সিধু-কানহুকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না? ভারতবর্ষে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের জন্য এক বা একাধিক জাতীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়। সেক্ষেত্রে, আমরা 'সাঁওতাল হুল' এর (৩০ জুন তারিখে) অমর শহীদদের জন্য একটি জাতীয় ছুটি কি আশা করতে পারি না? আশা করাটা কি অন্যায়?

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

1) The Annals of Rural Bengal—W. W. Hunter
2) The Santal Insurrection—K. K. Datta
3) Bengal District Gazetteers, Santal Pargana — L.S.S.O Malley
4) Sonthalia and the Santhals—E. G. Man
5) Santal Rebellion (Document)—Compiled by—
Tarapada Roy
6) History and Ethnology of an Indian upland -
F. B. Bradley Birt
7) Bengal Under Lt. Governor—C. E. Buckland
8) Santal Hul—Dr. S. P. Sinha
9) Traditions and Institutions of the Santals—P. O. Bodding
10) British Paramountcy and Indian Reneissance—
R. C. Mazumdar
11) Tribal Revolts—V. Raghabiah
১) ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়
২) সাঁওতাল বিদ্রোহের রোজনামচা—তারাপদ রায়
৩) বীরভূমের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)—গৌরহরি মিত্র
৪) হুল—অরুন চৌধুরী
৫) সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস—ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে
৬) Bihar Distirict Gazetters, Santal Pargana—P. C. Roychoudhury
৭) To be with the Santal—U. K Roy, A. K. Das & S. K. Basu
৮) BOMBAY, DECAN ROITS, 1876
৯) ভারতের কৃষক বিদ্রোহ—এল, নটরাজন
১০) স্বাধীনতা আন্দোলনে আদিবাসীদের ভূমিকা—গোপী নাথ সেন
১১) দেশের কথা—সখারাম গণেশ দেউসকর
১২) সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র—বিনয় ঘোষ
১৫) মুক্তির সন্ধানে ভারত—যোগেশ চন্দ্র বাগল
১৬) সিধু কানহু সান্তাড় হুল—রঘুনাথ মুরমু